লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১৯তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ৭ রজব, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ শাহাদত, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০১৬ ঈসাব্দ

আহমদনগর-শালসিড়ি’র ৭ম সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

বিস্তারিত পড়ুন ভিতরের পাতায়

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ১১তম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে। এ বছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দরখাস্ত আগামী ২৫/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী, বোর্ড গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবরে পৌঁছাতে হবে। আবেদনকারীদের ভর্তি পরীক্ষা ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার থেকে ০৩/০৬/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারীদেরকে ৩০/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৫.০০ টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ ঃ (১) এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে। (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেক-আপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ওয়াকফে নও প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতী বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে। (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী এবং নিজ বাড়ি অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আত গ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে (ছ) আবেদন পত্রে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে নচেৎ আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে (জ) জামাতি ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নায়েম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারীকে ভাল ভাবে চিনেন ও জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

ভর্তি-বিজ্ঞপ্তিটি সকল স্থানীয় জামাত, হালকা ও পকেট সমূহে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো। প্রয়োজনে যেসব মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ
সেক্রেটারী, বোর্ড অফ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

‘পরামর্শ সভা’
ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

‘মজলিসে শূরা’ (পরামর্শ সভা) ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। এটা নবুওয়ত এবং এর অবর্তমানে খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশ (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০, সূরাতুশ্ শূরা ঃ ৩৯) মোতাবেক মু’মিনদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাপারে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) মজলিসে শূরাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাঠামোগত রূপ দান করেন। শূরার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি (রা.) বর্ণনা করেছেন–“লা খিলাফাতা ইল্লা ‘আন মাশওয়ারাতিন”–অর্থাৎ পরামর্শ ব্যতিরেকে খেলাফত হতে পারে না। এটা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থেই কার্যকর ছিল। মজলিসে শূরার মাধ্যমে যুগ-খলীফার গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দায়িত্ব পালনের যে আমানত মু’মিন সমাজের ওপর বর্তায় নিবেদিত প্রাণ প্রত্যেক মু’মিন তা কার্যকর করতে সদা তৎপর থাকে।

‘মজলিসে শূরা’ প্রচলিত কোন ‘আইন সভা’ বা পার্লামেন্ট নয়। এখানে কোন বিরোধী দল বা ওয়াক আউট নেই। এখানে নির্দিষ্ট প্রস্তাবনার ওপর পরামর্শ চাওয়া হয়। অপ্রাসঙ্গিক বা বাহুল্য পরামর্শ দেয়ার সুযোগ এখানে নাই। মু’মিন সমাজ এক দেহ এক সত্তা হয়ে নেযামের আহ্বানে নির্ধারিত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এখানে কূট-তর্ক বা বিরূপ সমালোচনা বা বিরোধিতার অবকাশ নেই, বরং ব্যক্তি-স্বার্থের ভেদ-বুদ্ধির উর্ধ্বে থেকে সামগ্রিক উন্নতি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকেই এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে আছে অতীতের পর্যালোচনা, বর্তমানের জন্য দোয়া এবং ভবিষ্যতের জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তাকওয়াকেই (খোদাভীতি) এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়।

এ যুগে “খিলাফতে আ’লা মিন হাযিন নবুওয়ত”-এর ধারায় পুণঃ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফতে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলীফা ফযলে উমর হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইসলামী ব্যবস্থাপনা ‘মজলিসে শূরা’ পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকে ২/১টি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিবছর নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মজলিসে শূরা আহমদীয়াতের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে কার্যকর রয়েছে। আর এরই প্রতিচ্ছায়ারূপে দেশীয় জামা’ত সমূহে এই মজলিসে শূরা কার্যকর রয়েছে। জাতীয় গুরুত্ব বিবেচনায় যুগ-খলীফার অনুমতিক্রমে দেশীয় আমীরের আহ্বানে এই মজলিস নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের খলীফা (আই.)-কে পরামর্শ দিয়ে থাকে। খলীফায়ে ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই মজলিসে শূরায় গৃহীত পরামর্শ অনুমোদন করতে তিনি সর্বদা বাধ্য-নন বরং মু’মিন সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের তাগিদে তিনি তা নাকচ করারও ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, খলীফায়ে ওয়াক্তের এ পদক্ষেপ-ই মু’মিন সমাজের জন্য সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে আনে আর তাদেরকে করে আশিসমন্ডিত। ইসলামের ইতিহাসে এর জাজ্বল্যমান বহু প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে।

মজলিসে শুরার সদস্যগণ কেবলমাত্র পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হোন না বরং পরামর্শের প্রেক্ষিতে যুগ-খলীফার আশিসপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টাও চালিয়ে থাকেন। আর এই বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)।

আমরা মজলিসে শূরার সর্বাঙ্গীণ সুফল এবং স্থায়ীত্বের কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ্ তা’লা গোটা দুনিয়ার মানব সমাজকে মজলিসে শূরার পদ্ধতি উপলব্ধি ও অবলম্বন করা এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

সূচিপত্র

১৫ এপ্রিল, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর ডেস্ক থেকে ৬

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৮

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১লা এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১১

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১ ১৮
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ২১

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৯
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

কলমের জিহাদ ৩২
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

ইসলামী শিক্ষা
ভোটের আমানত যথোপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা ৩৪
মাহমুদ আহমদ সুমন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৭
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আহমদনগর, শালসিড়ি'র ৭তম আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৬
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালসিড়িতে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত ৩৯

সংবাদ ৪২

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৫

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী ৪৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৭

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী ৪৮

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

اَوۡ يَاۡخُذَهُمۡ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۴۸﴾

৪৮। অথবা তিনি ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের ধরে ফেলবেন না[১৫৪৯]? তবে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

اَوَلَمۡ يَرَوۡا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمۡ دٰخِرُوۡنَ ﴿۴۹﴾

৪৯। তারা কি লক্ষ করে দেখেনি, আল্লাহ্ যা-ই সৃষ্টি করেছেন এর ছায়া কখনো ডানে ও কখনো বামে[১৫৫০] স্থানান্তরিত হয়ে তাঁরই সমীপে সিজদাবনত হয়ে থাকে এবং এরা বিনয় অবলম্বনকারীও হয়ে থাকে?

وَلِلّٰهِ يَسۡجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ مِنۡ دَآبَّةٍ وَّالۡمَلٰٓئِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۵۰﴾

৫০। আর আকাশ সমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যে প্রাণীই আছে আর ফিরিশ্‌তারা (সবাই) আল্লাহ্‌র সমীপে সিজদা করে এবং তারা কোন অহংকার করে না।

يَخَافُوۡنَ رَبَّهُمۡ مِّنۡ فَوۡقِهِمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ ﴿۵۱﴾ ع

৫১। তারা তাদের ওপর (পরাক্রমশালী) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা তা-ই করে যা তাদের করতে বলা হয়।

১৫৪৯। 'আলাতাখাওওফেন' অর্থ ক্রমান্বয়ে ধৃত করা, হ্রাস করা (লেইন) আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কাফিরদের শক্তির প্রতাপ ক্রমশ লোপ পাবে। ইসলামের ক্রমোন্নত শক্তি এবং চূড়ান্ত বিজয়ের ভীতি তাদের চরম পরাজয়ের পূর্বেই তাদেরকে ধরে ফেলবে।

১৫৫০। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক বিশেষ পর্যায়ে বা অবস্থায় পৌঁছার পরে সঙ্কুচিত হয়। এতে এটাই প্রকাশিত হয়, তার ক্ষমতা, প্রতাপ ও মর্যাদা প্রায় শেষ বা প্রস্থানোদ্যত হয় এবং তা পুনরায় কমে বা সঙ্কুচিত হয়ে তার পূর্বেকার নিজস্ব অবস্থায় এক ক্ষুদ্র ছায়ারূপে পরিণত হয়। এইরূপে অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, ঐশী শাস্তি তাদের ছায়া বা প্রতিবিম্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবে। অন্যদিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ছায়া বা প্রতিবিম্ব ক্রমশই দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। কারণ বস্তুর প্রতিবিম্ব তখনই দীর্ঘ হয় যখন সূর্য তার আড়ালে থাকে। এস্থলে নবী করীম (সা.) এর পিছনে রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার রহমতের সূর্য।

হাদীস শরীফ

তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য ক্ষমা চাও

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু গুনাহ্‌গারের জন্যেই যে তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে, বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ যা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

কুরআন :

'আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনীত হও। তিনি তোমাদের উপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর তোমরা অপরাধে লিপ্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। (সূরা হূদ ঃ ৫৩)।

হাদীস :

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য মাফ চাও, আমি এক দিনে একশত বার তওবা করি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। অনেক সময়ে এ ভুলের অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। অনেক ভুলের সংশোধন নেই। যার ফলে অনেকে জীবনভর উহার মূল্য দিতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও অনুরূপ। মানুষ যেহেতু ভুল করে সেহেতু সে দুর্বল। কিন্তু পৃথিবীতে ক'জন আছে, যে নিজেকে দুর্বল বলে আখ্যা দেয়? খুব কম লোকই এমন রয়েছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বদা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত করতে চেয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে ঐ সকল নির্দেশ দিয়েছে যা তাকে উচ্চ আসনে সমাসীন করাতে পারে। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে আল্লাহ্ তাআলা তওবা করতে বলেছেন। ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তওবা বা ক্ষমা চাওয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি তোমরা তওবা কর তবে আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বৃষ্টি, ফসলাদি দান করবো। অর্থাৎ এক কথায় ক্ষমা চাওয়া একটি ফলদায়ক বৃক্ষ।

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু গুনাহ্‌গারের জন্যেই যে তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে, বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ যা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে নসীহত করেছেন, হে আমার উম্মত! তোমরা ইস্তেগফার কর। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। তোমরা আমাকে দেখো। আমিও দিনে সত্তর বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এখানে সত্তর অর্থ সত্তর নয় বরং অগণিত। হযরত নবী করীম (সা.)-এর মত নিষ্পাপ সত্ত্বা আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা, যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত। আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে যে শর্তে বয়আত হয়েছি সেখানে এ শর্তটি রয়েছে যে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবে এবং নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে। ইস্তেগফার মানুষকে বিনয়ী করে তুলে। মানুষকে অহং হতে মুক্ত করে। তাই আসুন আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী দৈনিক ইস্তেগফার করি ও খোদার আশীষের অধিকারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ,
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর উচিত নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয়, তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান।

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর উচিত নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত, যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) এবং তৃতীয় জন অর্থাৎ হযরত যুন্নুরাঈন [অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর অগ্রসেনানী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন।

সুতরাং যে তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না বরং তাদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের ওপর নোংরা আক্রমণ করে, আমি এমন ব্যক্তির অশুভ-পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হবার আশংকা করি। যারা তাদেরকে কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ষণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে–পরিণতিতে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়।

এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং একথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহজগতের মোহ ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয়, যা তাকে গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে। ফলে তার বোধবুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে-অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রাসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রাসূলদের উত্তরাধিকারী, তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার-দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল।

কেননা যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয়, তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রাসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসানুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

[সির্‌রুল খিলাফাহ্ (বাংলা সংস্করণ) ২০-২১ পৃ: থেকে উদ্ধৃত]

ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর ডেস্ক থেকে

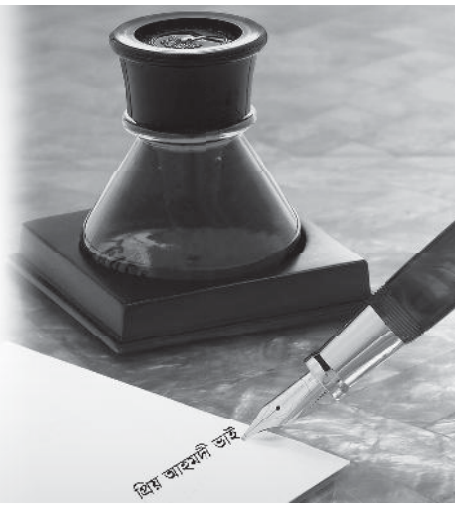

আল্লাহ্ খলীফা বানান
আমীর/প্রেসিডেন্ট খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হন

প্রিয় আহমদী ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

ওপরের প্রথম বিষয়টি প্রায় সব আহমদীরা জানেন। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'কিন্তু কিছু মানুষের মনে এই প্রশ্নটি থেকেই যায় যে, আমরা তো দেখি খলীফা মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে, তাহলে কেন বলা হয় খলীফা আল্লাহ্ বানিয়ে থাকেন।' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বক্তব্য শুনতে চাই খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি যে প্রথম ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন **'আমাকে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য খলীফা বানিয়েছেন যেন এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং তোমাদের একতা সুদৃঢ় করা যায়'** (দায়েরাতুল মারেফ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৫৮)। তাঁর এই বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়, খেলাফতের মূল দায়িত্ব যা তার ওপর ন্যস্ত হতে যাচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্বেই একথাটি জানিয়েছিলেন। আর নির্বাচনকারী মু'মিনদের তার দিকে আকৃষ্ট করে দেয়া আল্লাহ্‌রই কাজ।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন মু'মিনদের জন্য এই বিষয়টি বোঝা খুবই সহজ কিন্তু জাগতিক ধ্যান ধারণার মধ্যে মশগুল এবং কোনরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাহীন মানুষের জন্য বিষয়টি বোঝা কঠিন বৈ কী। এভাবেই প্রত্যেক খলীফার ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। হযরত উসমান (রা.)-কে যখন খলীফা নির্বাচন করা হয় তখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন মু'মিনদের হৃদয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই উক্তি নিশ্চয় মনে ছিল যে, **'হে উসমান! আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয় তোমাকে জামা পরাবেন। মুনাফেকরা তোমার থেকে সে জামা কেড়ে নিতে চাইবে। কিন্তু তুমি তা তাদের হাতে তুলে দিবে না এমনকি এভাবেই আমার সাথে গিয়ে মিলিত হবে'** (তিরমিযী, কানযুল উম্মাল)। মহানবী (সা.)-এর এই উক্তির মধ্যে একটি লুক্কায়িত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, একদিন হযরত উসমান (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা খলীফা বানাবেন অর্থাৎ খেলাফতের একটি চাদর তাকে পরানো হবে। আর কিছু লোক সেই চাদর খুলে নিতে চাইবে। বাস্তবে ঘটেছিলও তাই, একদল নওমুসলমান এবং বিপথগামী ও লোভ-লালসা সম্পন্ন লোকেরা হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের বিরোধিতা করে তাকে খেলাফত থেকে সরানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) রসূলের সেই বাণীকে স্মরণ রেখেছিলেন যে, তাকে খলীফা 'আল্লাহ্ বানিয়েছেন'। সুতরাং কিছু মানুষের ইচ্ছায় তিনি পদত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সত্যিকার মু'মিনগণের জামা'ত তখন সুসংগঠিত না থাকায় তাঁর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।

আল্লাহ্‌ই খলীফা বানান– এই বিষয়টি আমরা আবার হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জামা'তে দেখতে পাই। রসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে আবার **'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যত'**, অর্থাৎ নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর নিজের পুস্তক 'আল ওসীয়্যতে' তিনি লিখে গেছেন যে, তাঁর যুগের পরে দ্বিতীয় কুদরত প্রকাশিত হবে এবং কতিপয় ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করাবেন। নবুওয়তের ছায়ায় লালিত মু'মিনগণ এই কথাগুলোর সুস্পষ্ট অর্থ জানতেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের হৃদয় সেই ব্যক্তির দিকে আকৃষ্ট করে দেন যাকে আল্লাহ্ খলীফা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রথম খলীফার যে ভাষণ তা ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভাষণেরই প্রতিধ্বনি, সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন **"তোমরা আমাকে খলীফা বানাও নি আল্লাহ্ আমাকে খলীফা বানিয়েছেন"** আমাদের প্রত্যেক খলীফা নির্বাচন পরবর্তী বক্তব্য থেকে এই বিষয়টি জানা যায় তাছাড়া নির্বাচনকারী মু'মিনদের স্বাক্ষ্য এবং সাধারণ মু'মিনগণের বিভিন্ন স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন থেকেও জানা যায়, খলীফা হতে যাচ্ছেন কে? আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্বেই তাদের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তাই আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি খলীফা আল্লাহ্ই বানান।

আমীর/প্রেসিডেন্ট খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হন ঃ

মু'মিনগণের জামা'তকে সংঘবদ্ধ ও পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নবীগণকে একক অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছেন আবার একই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা নবীকে মু'মিনগণের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশও দিয়েছেন, সে অনুযায়ী তিনি মু'মিনগণের সঙ্গে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে কখনও এককভাবে কখনও ছোট ছোট দলের কাছে কখনও সমাবেশের মাধ্যমে মু'মিনদের পরামর্শ নিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'লা নবীর ওপরে ন্যস্ত রেখেছেন। **"ফা ইযা আযামতা ফা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্"** অর্থাৎ এরপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) দৃঢ়সংকল্প করে ফেল তখন আল্লাহ্রই ওপর ভরসা কর। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০)

খলীফাগণ যেহেতু নবীগণের স্থলাভিষিক্ত সেহেতু ঠিক একইভাবে খলীফাগণ নবীগণের ন্যায় জামা'ত পরিচালনা করে থাকেন। নবীগণের জামা'ত যখন নিজ শহরে ছাড়িয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে, দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদের সংগঠিত করার জন্য খলীফা প্রত্যেক স্থানীয় ও দেশীয় জামাতে আমীর বা প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে থাকেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য খেলাফত ব্যবস্থার অধীনে সারা বিশ্বে যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাতে স্থানীয় ও দেশীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছু সুস্পষ্ট পদ্ধতি খলীফার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন বড় বড় জামা'তগুলোতে (স্থানীয় বা দেশীয় যাই হোক না কেন) তিনি কাউকে আমীর নিযুক্ত করেন আর ছোট ছোট জামা'তগুলোতে (স্থানীয় বা দেশীয় যা-ই হোক না কেন) তিনি একজনকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট আমীরগণ মূলত মু'মিনগণের জামা'তের প্রধান, তবে তাদের দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্ষমতার মধ্যে কিছুটা কম-বেশী রয়েছে।

যখন জামা'ত বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিস্তৃত হয়ে যায় তখন সব অঞ্চলের মানুষকে খলীফার পক্ষে চেনা সম্ভব নাও হতে পারে আর এজন্যই তিনি ঐ সকল স্থানীয়, আঞ্চলিক বা দেশীয় জামা'তের মু'মিনগণের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। এই পরামর্শ গ্রহণ প্রক্রিয়া সুনির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। ছোট স্থানীয় আঞ্চলিক জামা'তগুলোতে মু'মিনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে নাম প্রস্তাব ও সামনা সামনি হাত তুলে ভোটের মাধ্যমে একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। মু'মিনদের ভোটে প্রস্তাবিত নামগুলোর মধ্য থেকে খলীফা যাকে চান তাকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করতে পারেন অথবা তিনি এর বাইরে থেকে অন্য কোন ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করতে পারেন। মু'মিনগণ জানেন যে প্রেসিডেন্ট/আমীর নিযুক্ত করা খলীফার একক অধিকার এবং আমাদের ভোটা-ভোটির মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র একটি পরামর্শ প্রদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছি। তিনি যাকেই নিযুক্ত করেন না কেন এটি তার অধিকার আমরা সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র তাঁরই আনুগত্য করবো।

জাতীয়/দেশীয় পর্যায়ে আমীর নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি একটি পরামর্শ সভার ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে প্রত্যেক স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, জাতীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগগণ এবং স্থানীয় জামাত থেকে কিছু নির্বাচিত সদস্য এই পরামর্শ সভার সদস্য হয়ে থাকেন। এই পরামর্শ সভা বছরে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে খলীফার অনুমোদনক্রমে মিলিত হয়ে খলীফাকে দেশীয়/জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই পরামর্শ সভায় খলীফার নির্দেশক্রমে ন্যাশনাল আমীর এবং তার কার্যকরী পরিষদের নাম ভোটাভোটির মাধ্যমে সুপারিশ করেন। খলীফা এই পরামর্শ গ্রহণ করতেও পারেন বা নাও পারেন বা তার পছন্দের জন্য কাউকে আমীর বা অন্যান্য পদে নিযুক্ত করতে পারেন।

মোটকথা, খলীফাগণের এটি একক এখতিয়ার যে, তিনি কাকে আমীর/প্রেসিডেন্ট বানাবেন। মু'মিনগণের দায়িত্ব খলীফার আনুগত্য করা। আমাদের কারো মনে যেন এ কথা ঘুণাক্ষরেও না আসে 'আমরা ওমুককে বেশি ভোট দিয়েছিলাম অথচ খলীফা অন্য একজনকে আমীর/প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন।' আর নির্বাচনী সভায় সামনা সামনি হাত তুলে ভোট নেওয়ার অর্থ হলো- আমরা জাতি, গোষ্ঠি, আত্মীয়, বন্ধু কোন কিছুর তোয়াক্কা করি না, শুধুমাত্র আল্লাহ্র খাতিরে, তাঁরই ভয় মনে রেখে (তাকওয়ার ভিত্তিতে) যাকে যোগ্য মনে করি তার নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করি। এতে কে কি মনে করলো তাতে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করি না। এটিই মু'মিনের পরিচয়।

ওয়াস্‌সালাম
দোয়াপ্রার্থী

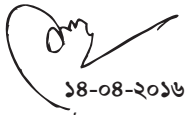

১৪-০৪-২০১৬
মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

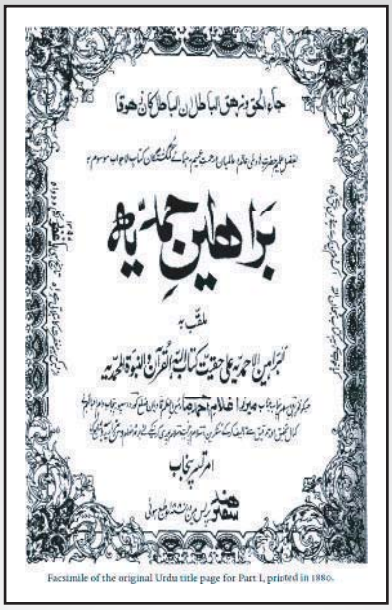

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১৪তম কিস্তি)

পরিতাপ! পন্ডিত দয়ানন্দের জন্য, সে তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন সম্পর্কে তার কোন-কোন পুস্তিকা ও বেদভাসের ভূমিকায় অনেক কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছে আর বেদ’কে খাঁটি সোনা আর বাকী সকল গ্রন্থকে মেকী আখ্যা দিয়েছে। এসকল হীন কথাবার্তা ও হীন ছলচাতুরির প্রধান কারণ হলো, পন্ডিত সাহেব আরবীও জানেন না, ফারসীও জানেন না এমন কী সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষা বলতেও পারেন না।

এর আরও একটি কারণ আছে যা তার সর্বশেষ বইগুলো পড়লে স্পষ্ট হয়ে যায়; তাহলো জ্ঞানের স্বল্পতা, জ্ঞানহীনতা ও বিদ্বেষ ছাড়াও তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিও উম্মাদ এবং সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় ভারসাম্যহীন এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যূত। পুণ্যবানকে পাপী আর পাপীকে পুণ্যবান, খাঁটিকে ভেজাল এবং ভেজালকে খাঁটি আখ্যা দেয়া, উল্টোকে সোজা আর সোজাকে উল্টো মনে করা তার বদঅভ্যাসে পরিণত হয়েছে যা অবলীলায় তার পক্ষ থেকে সর্বত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। এ কারণে তিনি বেদের সেসব ব্যাখ্যা করেন যা কোন যুগে কেউ স্বপ্নেও দেখেনি; অধিকন্তু সেসকল ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণাকে ছাপিয়ে মানুষের হাতে নিজেকে লাঞ্ছিত করেন। সমগ্র ভারতের হিন্দু পন্ডিতরা যদিও হৈ-চৈ করছে যে, আমাদের বেদে একত্ববাদের নামগন্ধও নেই, আমাদের পিতা-পিতামহরা কখনও এ পাঠ নেয়নি আর বেদ কোথাও সৃষ্টিপূজা হতে আমাদের বারণ করেনি; কিন্তু পন্ডিতজী তবুও কাল্পনিক কথা বলা হতে বিরত হন না আর বেদের ইলহামী হওয়া যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদের বিভিন্ন মা’বুদ বা উপাস্যকে এক খোদা বানাতে চান যাদের সংখ্যা হলো বাস্তবে শতশত।

যাইহোক, তিনি বেদে যে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং করছেন সেটাতো তার স্বাধীনতা যা তিনি ভোগ করছেন। কিন্তু কুরআন শরীফের অনর্থক অসম্মান ও অবমাননা করা এমন একটি কাজ যার ফলে তাকে মারাত্মক লাঞ্ছনা পোহাতে হবে। এই গ্রন্থ লেখার মাধ্যমে সেই দিন এসে গেছে। এখন পন্ডিত সাহেব কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের আর বেদের নীতি মিথ্যা হওয়া সংক্রান্ত শতশত প্রমাণ কোন শিক্ষিত মানুষের মাধ্যমে এই

গ্রন্থ হতে অবগত হওয়ার পরও কি জীবিত থাকতে চাইবেন নাকি তার আত্মহত্যার প্রবল বাসনা জাগবে, তা আমরা জানি না।

কতবড় পরিতাপের বিষয় যে, কুরআনের মত সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ ও উৎকর্ষ, সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থের অবমাননা করতে গিয়ে তিনি না পরকালের লাঞ্ছনাকে ভয় করেন না ইহলৌকিক অভিশাপ ও সমালোচনাকে ভয় করেন। হয়ত তিনি উভয় জগতকে কোন গুরুত্বই দেননি। খোদার ভয় না থাকলেও নিদেন পক্ষে এ পৃথিবীর লাঞ্ছনাকে তার ভয় করা উচিত ছিল। লজ্জাবোধ যদি লোপ পেয়ে থাকে অন্ততপক্ষে মানুষের সমালোচনা ও অভিশাপের ভয় থাকলেও হতো। যদি পন্ডিত সাহেবের প্রকৃতিই এমন হয়ে থাকে যে, তিনি খোদার পবিত্র রসূলদের অন্যায়ভাবে অবমাননা করে আনন্দ পান আর আপন অভ্যাসের ওপর যদি তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণই না থাকে তবে প্রশ্ন হলো, এটি করে তিনি খোদার পবিত্র লোকদের কী-ই বা ক্ষতি করতে পারবেন?

ইতোপূর্বে নবীদের শত্রুরা এসকল প্রদীপ্ত চেরাগ নিভিয়ে দেয়ার মানসে হেন কী কাজ আছে যা করেনি? কোন্ ষড়যন্ত্র আছে যা আঁটেনি? কিন্তু তাঁরা যেহেতু সত্য ও সততার বৃক্ষ ছিলেন, তাই অদৃশ্য সাহায্যের কল্যাণে তাঁরা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত উন্নতি করেছেন আর শত্রুদের বিরোধিতামূলক ষড়যন্ত্রে তাঁদের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং তাঁরা মালিকের হৃদয়কে প্রীত করে, সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন চারা গাছের ন্যায় উন্নতির পর উন্নতি করেছেন এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছেন। একপর্যায়ে তাঁরা ছায়াপ্রদ ও ফলবান মহীরূহে পরিণত হয়েছেন। আর দূর-দূরান্তের আধ্যাত্মিক ও সত্যিকার আরাম-পিয়াসী পাখীরা এসে এতে বাসা বেঁধেছে– বিরোধীদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রদ হয়নি। যদিও এসব দুরভিসন্ধি-বাজরা অনেক চেষ্টা-তদবীর করেছে, জুতার তলা ক্ষয় করেছে, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু পিঞ্জিরার পাখির মত ছটফট করা ছাড়া তারা আর কিছুই করে ওঠতে পারেনি। যেখানে হাতদ্বারা এসকল পবিত্রদের কোন ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি সেখানে অবমাননাকর কথার মাধ্যমে কীভাবে তাদের ক্ষতি হতে পারে? এরা সেই মনোনীত জাতি যাদের সম্মানিত ও গৃহীত হওয়ার পরীক্ষা তাঁদের স্ব-স্ব যুগেই হয়ে গেছে। প্রতিমাপূজারীদের বাধার মুখেও সেই সম্মানের কোন হানী হয়নি আর প্রকৃতি-পূজারীদের প্রতিবন্ধকতার ফলেও তা থেমে যায়নি। তরবারীর প্রখরতাও এই সম্মান এবং মহিমাকে কাটতে ব্যর্থ হয়েছে আর তীরের প্রবল গতিও এতে কোন বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারেনি। সেই প্রতাপের ঔজ্জ্বল্য এত প্রখর ছিল যে, এর প্রতি হিংসা পোষণ অনেকের রক্ত পানি করে দিয়েছে।

খোদার পবিত্র বান্দারা খোদার সাহায্য লাভ করে থাকেন

যখন তা আসে কেবল তখনই বিশ্ব জগতের প্রকৃত রহস্য উম্মোচিত হয় ।

কোন সময় তা বাতাসে রূপ নেয় আর পথের সকল খড়-কুটো উড়িয়ে নিয়ে যায়।

কোন সময় তা অগ্নির রূপ ধারণ করে আর সকল বিরোধীকে ভস্মীভূত করে।

কোন সময় তা ধূলা হয়ে শত্রুর মাথায় পড়ে

কোন সময় তা পানি হয়ে তাদের ওপর তুফান আনয়ন করে।

এককথায় বান্দার চেষ্টায় খোদার কাজ বন্ধ হতে পারে না

স্রষ্টার বিরোধীতা করে সৃষ্টিও কী সফল হতে পারে?

এই বক্তৃতার সারকথা হলো, যদি পন্ডিত সাহেব প্রমূখ বিরোধী ও শত্রুদের জগৎপ্রেম ও জাতির ভালবাসার কারণে বা মিথ্যা আত্মাভিমান ও মিথ্যা সম্মানের অজুহাতে বা লজ্জাবোধের ঘাটতির কারণে খোদার সত্য গ্রন্থাবলীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন পছন্দ না হয় তাহলে সেটা তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমরা তাদের নসীহত করছি যে, অন্ততপক্ষে গালমন্দ করা থেকে বিরত হোন, কেননা, এর পরিণাম শুভ হয় না। কথার কথা যদি আমরা ধরেও নেই যে, তাদের অদ্ভুত বিবেকের কাছে খোদার পবিত্র নবীদের সত্যতা প্রমাণিত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যার হৃদয়ে কিছুটা খোদাভীতি বা মানুষের সমালোচনার ভয় আছে সে অবশ্যই স্বীকার করবে যে, সত্যতার প্রমাণ না থাকা কোনভাবে মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ নয়। কেননা 'যায়েদের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত নয়' বাক্যটির অর্থ যায়েদের মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত বিষয়– এর সমান হতে পারে না।

সুতরাং যখন কোন ব্যক্তির মিথ্যা হওয়া প্রমাণিত নয়, সে ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে মিথ্যার সিদ্ধান্ত দেয়া এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে বেড়ানো সত্যিকার অর্থে সেই সকল লোকের কাজ যাদের একমাত্র ধর্ম, ঈমান, পরমেশ্বর ও ভগবান হলো, জাগতিক স্বার্থ বা মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ বা জাতি ও বংশের মিছে গৌরব। যদি তারা সত্য গ্রহণ করে আর সকল প্রকার হঠকারিতা পরিত্যাগ করে তাহলে এক দরিদ্র ও দরবেশের মত সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ঐশীধর্মে প্রবেশ করতে হবে আর এহেন পরিস্থিতিতে কে তাদের গুরুজী, পন্ডিতজী এবং স্বামীজী বলে ডাকবে?

অতএব এমন মানুষ যদি সত্য ও সততার পথে বাঁধ না সাধে তাহলে আর কে সাধবে? যদি তাদের ক্রোধ ও রাগ প্রকাশ না পায় তাহলে আর কার প্রকাশ পাবে? ইসলামের সম্মানের কথা স্বীকার করলে তাদের নিজেদের সম্মানহানি হয়, বিভিন্ন প্রকার জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যায়, তাই এক ইসলামকে গ্রহণ করে কেন তারা সহস্র বিপদকে আমন্ত্রণ জানাবে? যেই সত্যকে বিশ্বাস করার শত শত কারণ ও যুক্তি রয়েছে, এ কারণেই তা গ্রহণ করে না।

পক্ষান্তরে যেসকল গ্রন্থের শিক্ষার প্রতিটি অক্ষর শির্কের শিক্ষা দেয়, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা বসে আছে। কোন মহিলা, যার চরিত্র প্রশ্নাতীত নয়, তাকে যদি কোন নিষিদ্ধ কাজের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে বলে বসে যে, কে তাকে হাতেনাতে ধরেছে? কে দেখেছে? আর কে-ই বা ঘটনার সাক্ষী? এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও তাদের অন্যায় স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু সেসব পবিত্রচেতা

লোক যাদের সততার সাক্ষ্য এক বা দু'জন নয় বরং কোটি কোটি মানুষ দিয়ে এসেছে, তাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপে এরা ব্যগ্র; অথচ একথার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই যে, তারা কারো চোখের সামনে প্রতারণামূলক পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন বা এ ষড়যন্ত্রমূলক কাজে কারো পরামর্শ নিয়েছেন বা সেই রহস্য নিজের চাকর-বাকরদের বা বন্ধু-বান্ধবদের বা মহিলাদের কাউকে বলেছেন বা কোন ব্যক্তি পরামর্শ করতে বা গোপন বিষয় বলতে হাতেনাতে তাদের ধরে ফেলেছে বা মৃত্যুকে সামনে দেখে নিজেই প্রতারক হওয়ার কথা স্বীকার করে বসেছেন! সুতরাং এটিই তাদের হৃদয়ের নোংরামীর প্রমাণ আর এর মাধ্যমেই তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাধি ধরা পড়ে।

নবীরা এমন মানুষ যারা নিজেদের পূর্ণ সততার সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শত্রুদেরও অভিযুক্ত করেছেন।

যেমন কুরআন শরীফে যে স্থানে

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(সূরা ইউনুস: ১৭) বলেছেন, সেখানে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই অভিযোগই আনা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এমন নই যে, মিথ্যা বলব বা প্রতারণার আশ্রয় নেবো।

দেখ, ইতোপূর্বে আমি চল্লিশটি বছর তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করে এসেছি; তোমরা কখনও আমার কোন মিথ্যা বা প্রতারণা প্রমাণ করেছ কি? তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না? অর্থাৎ, যে আজ পর্যন্ত কোন প্রকার মিথ্যা বলেনি এখন খোদার নামে কীভাবে মিথ্যা বলতে আরম্ভ করল? একথায় নবীদের জীবনের ঘটনা প্রবাহ আর তাঁদের সুস্থ আচার-ব্যবহার এত স্পষ্ট ও প্রমাণিত বিষয় যে, যদি সব কথা বাদ দিয়ে কেবল তাঁদের ঘটনাবলীই দেখা হয় তাহলে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী হতেই তাদের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কোন ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান ব্যক্তি এ গ্রন্থে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সত্যতার যে সকল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত হবে তা একপাশে রেখে কেবল তাঁর আচরিত জীবন নিয়েই চিন্তা করে তাহলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন। আর কেনই-বা করবে না! সে সকল ঘটনা এতটাই সত্য ও স্বচ্ছতায় সৌরভিত যে, সত্য সন্ধানীদের হৃদয় অবলীলায় সেদিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন :

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহর ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

[প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত পুস্তক 'নুরুল হক', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে জানতে লগইন করুন:-
www.alislam.org, www.ahmadiyyabangla.org, www.mta.tv

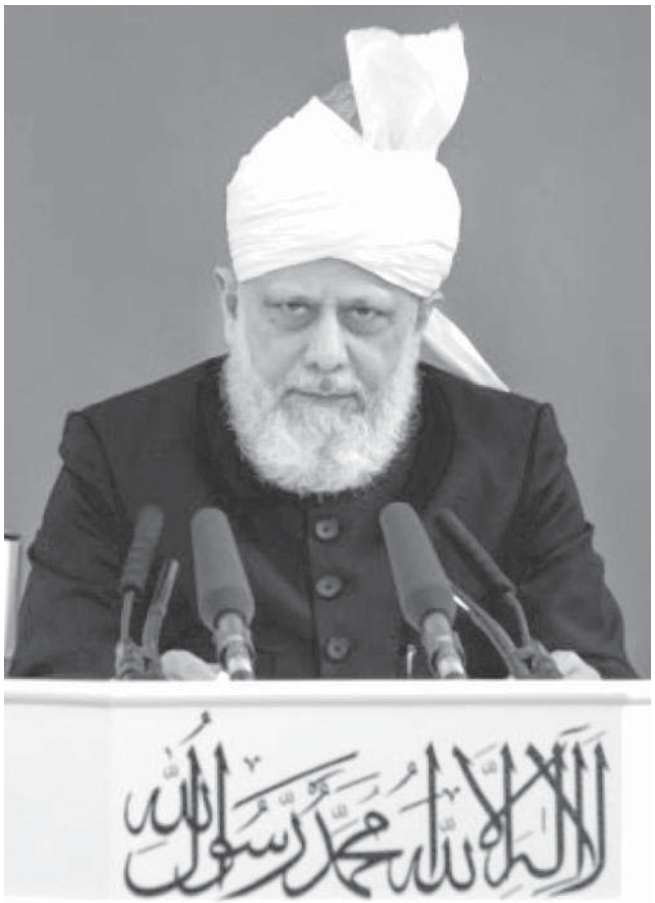

জুমুআর খুতবা

মোহরানা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১লা এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনিয়েছিলাম যাতে তিনি বলেছেন, "তোমরা যারা আমার যুগে জন্মগ্রহণ করেছ আনন্দিত হও এবং আনন্দের বহিঃপ্রকাশ কর যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এ যুগে সৃষ্টি করে সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা সেই যুগ মসীহ্‌র যুগ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে যার অপেক্ষায় বহু প্রজন্ম এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।"

সেই উদ্ধৃতির সারমর্ম এটিই ছিল যা আমি নিজের ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমরা আহমদীরা নিঃসন্দেহে সেসব সৌভাগ্যবান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে আর সেসব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে। আমরা সেসব দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেনি। বরং কতেক এমন দুর্ভাগাও আছে যারা বিরোধিতায় সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে আর এভাবে তারা খোদার প্রেরিত মহাপুরুষের দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলার শিকার।

অতএব এজন্য আমরা খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না, কেননা তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন আর জীবনের বিভিন্ন মোড়ে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয় প্রকৃত ইসলামী শিক্ষানুসারে সেগুলোর সমাধানও তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের মাধ্যমে আমাদের অবহিত করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলী, বক্তৃতা এবং বিভিন্ন বৈঠক ও অধিবেশনে কিছু কিছু বিষয় উদাহারণের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন যা তাঁর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা হতে জানা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)।

তিনি তাঁর খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছেন যা সচরাচর তিনি স্বয়ং দেখেছেন বা শুনেছেন বা তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীরা তাঁকে অবহিত করেছেন। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা উপমার মাধ্যমে কোন কথা বোঝা সহজসাধ্য হয়ে যায়। বেশ

কিছুকাল থেকে আমি এসব বিষয় ও ঘটনাবলী খুতবায় বর্ণনা করে আসছি। এপ্রেক্ষাপটে আমি বেশ কিছু পত্র পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে, এসব ঘটনা বা উদাহারণের মাধ্যমে আমাদের জন্য বিভিন্ন বিষয় বোঝা সহজ হয়ে উঠেছে। যাহোক, আজকের খুতবাও এই প্রেক্ষিতেই প্রদান করা হবে।

হরতাল বা স্ট্রাইক করা বৈধ কিনা –এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে নীতিগতভাবে দেখা উচিত যে, হরতাল বা স্ট্রাইক কেন করা হয়, এর মূল কারণ কি? এর মৌলিক কারণ হলো, ন্যায্য অধিকার প্রদান না করা। জাগতিক বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় কখনও মালিক শ্রমিকের অধিকার বা প্রাপ্য দেয় না আবার অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকও সুযোগ পেলে মালিকের অধিকার প্রদান করে না এবং এরফলে বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি দেখা দেয়। কখনও সরকার নাগরিকদের অধিকার প্রদান করে না আবার কখনও প্রজা সরকারের প্রাপ্য প্রদান করে না। মালিক এবং সরকার যদি অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না করে তাহলে স্পষ্টতঃই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু শ্রমিক বা প্রজা যদি প্রাপ্য এবং অধিকার প্রদান না করে তখন তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত হয়। অতএব জাগতিক বিষয়াদিতে মানুষ একটি শয়তানী চক্রে পরিবেষ্টিত।

তাই ইসলামী শিক্ষা হলো, তোমরা পরস্পরঅপরিচিত মানুষের মতো ব্যবহার করো না বরং পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে পরস্পরের প্রতি যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালনের চেষ্টা কর, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা কর, তাহলে জাগতিক সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখা দিবে না। এই হলো এ সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতির সার কথা। আর এটি শুধু ইসলামী সরকার ব্যবস্থার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাগতিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। আর যেখানে অধিকার নেয়ার প্রশ্ন আসে সেখানে স্ট্রাইক বা ধর্মঘটের পরিবর্তে এবং বেআইনী পন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

যাহোক, এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলামী শাসনের ভিত্তি হলো, ন্যায়বিচার ও ভালোবাসার ওপর। তাই নিজের অধিকার পাওয়ার জন্যও সেই রীতি অবলম্বন করা উচিত যা ইনসাফ এবং ভালোবাসা ভিত্তিক। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে সংঘটিত হরতালে কোন আহমদী অংশ নিলে তিনি (আ.) তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।

আজকাল বিভিন্ন ইসলামী বিশ্বে যেসব স্ট্রাইক বা বিদ্রোহ হয় এর পেছনে যেখানে শয়তানী অপশক্তির হাত রয়েছে সেখানে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করার কারণেও সচরাচর সরকার এবং জনসাধারণের মাঝে অশান্তি এবং টানাপোড়নবিরাজ করে। সরকার যদি সুবিচার-ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে তাহলে যেসব শয়তানী অপশক্তি বা বহিরাগত শক্তি রয়েছে, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তারাও কোন সুযোগ পাবে না কেননা; জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার যদি প্রদান করা হয় তাহলে কেউ, কোন মৌলভী বা কোন নৈরাজ্যবাদী বা কোন দুস্কৃতকারী বা কোন বিদ্রোহী আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর পেছনে চলবে না। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশগুলোকে বিশেষ করে পাকিস্তানকে অর্থাৎ এসব দেশের শাসকদের তৌফিক দিন তারা যেন জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারে। সব আহমদীর এ জন্য দোয়া করা উচিত। যদি কোন ক্ষেত্রে কোন আহমদীকে জোর পূর্বক ধর্মঘটে টেনেও নেয়া হয় তাহলে বাধ্য-বাধকতার ক্ষেত্রে তাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যা সরকারী সম্পত্তির বা সরকারী ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতিতে পর্যবসিত হতে পারে।

একটি সাধারণ নীতি হলো, কোন মানুষ সে যে পেশার সাথেই যুক্ত হোক না কেন, যদি সে নিজের কাজের প্রতি আগ্রহ রাখে তাহলে স্বীয় সকল শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করে সে সেই কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহারণ দিয়ে বলেন, কেউ যদি সেনা, শিক্ষক, বিচারক, উকীল, ব্যবসায়ী অথবা সংসদের সেক্রেটারী, স্পিকার বা সরকারের কোন মন্ত্রী হয় বা যেই হোক না কেন, সততার সাথে যে কাজ করে, মন দিয়ে যে কাজ করে এবং পুরো সময় কাজে ব্যায় করে আর সন্ধার সময় যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় বিশ্রাম করে, সে একথাই বলে যে, সারাদিনের কর্মব্যস্ততা এবং কাজের বোঝা আমাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে।

কিন্তু আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাকাই তখন দেখি যে, তিনি আমাদের জন্য যে আদর্শই রেখে গেছেন তা কেবল তাঁরই বিশেষত্ব। এসব কাজ, যা জীবনের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সাথে যুক্ত মানুষ করে থাকে, সেসব কাজ তাদের সবার চেয়ে বেশি তিনি (সা.)-কে করতে দেখা যায়। তিনি (সা.) বিচারকও ছিলেন, শিক্ষকও ছিলেন আবার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বাবলীও পালন করতেন কেননা; তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। আইন প্রণয়নও করতেন বা আইনের খুঁটিনাটিও ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু একই সাথে সংসারিক কাজকর্মও করতেন। স্ত্রীদের সাহায্যও করতেন। তিনি কখনও একথা বলেন নি যে, আমি অনেক ব্যস্ত মানুষ, তাই তোমাদের গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করতে পারব না। এ সম্পর্কে কিছুটা বিশদ আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, দেখ! মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করতেন আর এত গভীর মনোযোগ সহকারে প্রদান করতেন যে, প্রত্যেক স্ত্রী'ই মনে করতেন, তাঁর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ রয়েছে আমার প্রতি। আর স্ত্রীও একজন নয় বরং তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। নয়জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাদের একজনও একথা মনে করতেন না যে, আমার প্রতি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে না। মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল আসরের নামাযের পর একবার করে তিনি সব স্ত্রীর ঘরে যেতেন এবং তাদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন।

অনেক সময় ঘর-গৃহস্থালির কাজেও তিনি তাদের সাহায্য করতেন যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে ।এসব কাজ ছাড়াও তাঁর আরও অনেক কাজ ছিল যা তিনি (সা.)

করতেন। তাঁর জীবনের কোন একটি মুহূর্তও কর্ম-বিহীন ছিল না। তিনিও সেই দেশে বসবাস করতেন যেই দেশ সম্পর্কে বলা হয়, এটি ম্যালেরিয়া কবলিত দেশ। এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশে বসবাসকারী মানুষ কাজ না করার বা আলস্যের কারণ হিসেবে সেই এলাকায় বসবাসকে দায়ী করে এবং বলে, এটি ম্যালেরিয়া কবলিত দেশ। এখানে ম্যালেরিয়া রয়েছে, মানুষ এতে আক্রান্ত হয় আর এ কারণেই তিনি এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।রসূলুল্লাহ্ (সা.) এত সব কাজের পাশাপাশি আবার পারিবারিক বা সাংসারিক কাজও করতেন। অথচ তিনিও সে অঞ্চলেই বসবাস করতেন যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। আফ্রিকা এবং এশিয়ার মানুষ অজুহাত দেখায় যে, আমাদের আলস্যের কারণ এটি আর কাজ না করার কারণ সেটি। কিন্তু এ কারণগুলো সেখানেও বিদ্যমান ছিল যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসবাস করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও আমরা দেখেছি; তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজের অবস্থা যা ছিল তাহলো, আমরা যখন ঘুমাতাম তখনও তাঁকে কাজে রত দেখতাম আর যখন চোখ খুলতো তখনও তাঁকে কাজেই রত পেতাম। এত পরিশ্রম আর এত কষ্ট করা সত্যেও যেসব বন্ধুরা তার বইয়ের প্রুফ পড়ার কাজে অংশ নিত তিনি তাদের এতটা মূল্যায়ন করতেন যে, এশার সময়ও যদি কেউ ডাকত যে, হুযূর আমি প্রুফ নিয়ে এসেছি, তিনি বিছানা থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত যেতে গিয়ে রাস্তায় বেশ কয়েকবার বলতেন, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার বড় কষ্ট হয়েছে, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে; অথচ সেই কাজ অর্থাৎ প্রুফ রিডার যে কাজ করতো তা সেই কাজের মোকাবিলায় কিছুই ছিল না যা তিনি (আ.) নিজে করতেন।

বস্তুতঃ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাঝে কাজের এমন অভ্যাস দেখেছি আর এটি দেখে আমরা আশ্চর্য হতাম। অসুস্থতার কারণে অনেক সময় তাঁকে পায়চারি করতে হতো আর সেই অবস্থায়ও তিনি কাজে রত থাকতেন। ভ্রমণের জন্য গেলেও রাস্তায় বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের কথা বলতেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন, অথচ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও এই ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চলেই বসবাস করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের আলস্যের জন্য রোগকে দায়ী করা উচিত নয় যা সচরাচর আমরা করে থাকি। তাই যারা অলস আর আলস্যের কারণে আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে তাদের দেহ নয় বরং হৃদয় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। তারা যদি দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমরা পরিশ্রম করব তাহলে নিমিষেই এসব আলস্য দূরীভূত হতে পারে। ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চল তো একটি অজুহাত মাত্র, যারা সেসব অঞ্চল থেকে এখানে অর্থাৎ ইউরোপে এসে বসতি গেড়েছে তাদের মাঝেও অনেকে এমন আছে যারা ঘরে বসে থাকে, সারাদিন ঘরে বসে হয়তো টেলিভিশন দেখে বা স্ত্রীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকে বা ছেলেমেয়েদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে যে, তারাও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যায়। অতএব এটি কোন রোগ নয় বরং রোগের অজুহাত মাত্র। এটি কার্যতঃ আলস্য এবং ঔদাসীন্য কেননা; এখানে জীবন-জীবিকার চিন্তা নেই, কোন অজুহাত দেখিয়ে মানুষ বেকার ভাতা তো পেয়েই যায়, তাই কোন কাজ করে না। অতএব এই আলস্য এবং ঔদাসীন্য এখানে বসবাসকারী লোকদেরও পরিহার করতে হবে।

ইসলামে মহিলাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার বিভিন্ন রীতি আছে এর একটি হলো মোহরানা যা তার বিয়েরসময় তার জন্য নির্ধারিত হয়। অতএব সেই মোহরানা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। অনেকেই মনে করে, কেবল খোলা বা তালাকের ক্ষেত্রেই মোহরানা দিতে হয়; কিন্তু মোহরানার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে হবে। এটি সেই টাকাযা মহিলার হস্তগত হওয়া চাই যেন প্রয়োজনে বা কোন বিশেষ কারণে যদি তাকে খরচ করতে হয় আর যে খরচের টাকা স্বামীর কাছে চাইতে সে দ্বিধাবোধ করে বা তার লজ্জা হয়। অথবা অনেক সময় এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যা যথাসময়ে স্বামীও পূরণ করতে পারে না। মহিলার কাছে কিছু জমা টাকা থাকলে তিনি তার চাহিদা অনুসারে বা প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে খরচ করতে পারেন- এহলো মোহরানার উদ্দেশ্য হলো। যদি হক্ব মোহর না দেয়া হয় তাহলে এই যে দু'টি পরিস্থিতির কথা আমি উল্লেখ করলাম সেগুলো বা অন্য কোন প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। যেমন কোন মহিলার নিজের প্রয়োজন থাকে, কোন আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করতে হয় আর স্বামীকে তা জানাতে চায় না, তাই তার কাছে এই টাকা গচ্ছিত থাকা উচিত। এমন কিছু টাকা তার কাছে অবশ্যই থাকা উচিত যা তার তাৎক্ষণিক চাহিদা বা নিজের পছন্দের কোন স্থানে খরচ করতে পারে। অনেক সময় স্বামীর মোহরানা প্রদান তো দূরের কথা, মহিলা নিজে যে আয় করে তার ওপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং বলে যে জিজ্ঞেস না করে টাকা খরচ করবে না বা আমাদের তা থেকে দাও, এই পুরো আয়ের এত অংশ আমাদের কাছে আসা উচিত বা আমাদের ব্যাংক একাউন্টে যাওয়া উচিত– এটি সম্পূর্ণরূপে অবৈধ আচরণ। অনুরূপভাবে কিছু দরিদ্র পরিবারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলোর রীতি হলো, বিয়ের সময় মেয়ের স্বামী বা শ্বশুরের কাছ থেকে মেয়ের পিতামাতাই মোহরানা হস্তগত করে নেয় আর মেয়ে কিছুই পায় না। সে বিয়ের পর রিক্তহস্ত থেকে যায়। এটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত রীতি। এটি মেয়েদের বিক্রি করার নামান্তর, যে সম্পর্কে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অনুরূপভাবে অনেক সময় কোন কোন মেয়ে স্বামীদের মোহরানা মাফ করে দেয় কিন্তু এর জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে। তাদের হাতে টাকা দেওয়ার পর জিজ্ঞেস কর, ক্ষমা করবে কি-না। বরং হযরত ওমর (রা.) এবং কোন কোন ইমাম ও প্রবীণদের সিদ্ধান্ত হলো, মোহরানা মহিলার হাতে তুলে দাও, এরপর এক বছর পর্যন্ত তা সে নিজের কাছে রাখবে, এরপর যদি মহিলা চায় তাহলে স্বামীকে তা ফেরত দিতে পারে। অতএব প্রথমে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত, এরপর যদি সে চায় তাহলে ক্ষমা করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মোহরানা মাফ করা সংক্রান্ত এমনই একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবীর সাথে সম্পর্ক রাখে। হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব আমাদের জামাতের প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার দু'জন স্ত্রী ছিলেন। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মোহরানা প্রদান করা শরীয়তের নির্দেশ, মহিলাদের তা অবশ্যই দেয়া উচিত। তখন হাকীম সাহেব বলেন যে, আমার স্ত্রীরা মোহরানা মওকুফ করে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আপনি কি তাদের হাতে টাকা রেখে দিয়ে তারপর ক্ষমা করিয়েছিলেন। তিনি বলেন, না হুযূর! আমি এমনিতেই বলেছিলাম আর তারা ছেড়ে দিয়েছে বা মওকুফ করে দিয়েছে। হুযূর বলেন, প্রথমে তাদের ঝুলিতে টাকা রাখুন, এরপর মওকুফ করান। কিন্তু এটিও নিম্নমানের নেকী, সঠিক বিষয় হলো, টাকা অন্ততঃপক্ষে এক বছর মহিলার কাছে থাকা উচিত, এই সময়ের ভেতর যদি সে ক্ষমা করে তাহলে যথার্থ হবে। তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিলেন আর মোহরানা ছিল পাঁচশত রুপি করে। হাকীম সাহেব কোন স্থান থেকে ঋণ করে তাদের হাতে পাঁচ শত রুপিকরে তুলে দেন এবং বলেন, তোমাদের স্মরণ থাকবে যে, তোমরা মোহরানা মওকুফ করে দিয়েছ, তাই এখন এই রুপি আমাকে ফেরত দাও। তখন তার স্ত্রীরা বলেন, আমরা তো জানতাম না যে, আপনি আমাদেরকে রুপি দিবেন, তাই আমরা মওকুফ করেছিলাম কিন্তু এখন যখন রুপি আমাদের হাতে এসে গেছে তাই আমরা তা আর ফেরত দিচ্ছি না। হাকীম সাহেব এসে এই ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে শুনান যে, আমি ভেবেছিলাম এই রুপি আমি ফিরে পাব, তাই এক হাজার রুপি ঋণ করে উভয় স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে প্রদান করেছি কিন্তু এখন রুপি নিয়ে তারা তা মাফ করতে অস্বীকার করছে।

হুযূর একথা শুনে হাসেন এবং বলেন, এটিই সঠিক রীতি। প্রথমে মহিলার হাতে মোহরানা রেখে দাও, এর কিছুদিন পর যদি তারা ক্ষমা করতে চায় তাহলে করতে পারে কিন্তু তা না দিয়েই ক্ষমা আদায় করা, এটি অলীক বা ফাঁকা অনুগ্রহ আদায় করারই নামান্তর। কেননা মহিলা জানে, মোহরানা দেয়নি আর দেবেও না, এখন যেহেতু ক্ষমা চাচ্ছে তাই কথা সর্বস্ব অনুগ্রহই করি। অতএব মহিলার হাতে মোহরানার অর্থ আসার পর যদি সে সানন্দে ক্ষমা করে তাহলে ঠিক আছে নতুবা তার মোহরানা যদি দশ লক্ষ রুপিও হয় আর তা তার হাতে না আসে তাহলে সে তা-ও ফেরত দেবে, কেননা সে জানে,নিজের পকেট থেকেতো কিছু দিচ্ছি না, এটি কেবল কথার কথা, তাই একথা বলতে অসুবিধা কি। তাই মওকুফ করাবার পূর্বে মোহরানা তাদের হাতে তুলে দেয়া আবশ্যক। অনেকে ক্ষেত্রে মোহরানা এমন সময়ে দেয়া হয় যখন তারা নিজেদেরই ব্যয়ের খাত সম্পর্কে অবহিত থাকে না। অনেক সময় মহিলারা জানেন না, কোন স্থানে খরচ করতে হবে বা ব্যয় হবে। অথবা অনেক সময় মেয়ের পিতামাতা নিজেরাই জবরদস্তি ছেলের কাছ থেকে বা তার পিতামাতার কাছ থেকে মোহরানার টাকা হস্তগত করে– এটি অবৈধ। এটি কন্যাকে বিক্রি করার নামান্তর যা কোনভাবেই বৈধ নয়।

এরপর যাকাত রয়েছে। যাকাত প্রদান করা আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ব্যক্তি যার ক্ষেত্রে যাকাতের শর্ত পূরণ হয় তার জন্য যাকাত প্রদান আবশ্যক। কিন্তু কিছু এমন বুযূর্গও রয়েছেন যাদের কাছে যত সম্পদই আসুক, যত আয়ই হোক না কেন তারা তা খোদার পথে ব্যয় করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এমনই এক পুণ্যবান ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীতে কতক এমন মানুষও রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, কেউ একজন পুণ্যবান ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে, কত টাকার ওপর যাকাত আবশ্যক? তিনি বলেন, তোমার জন্য বিষয় হলো, প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত দাও বা যাকাত প্রদান কর। সেই ব্যক্তি তখন প্রশ্ন করে, আপনি যে, বললেন তোমার জন্য, এই তোমার জন্য শব্দের অর্থ কি? যাকাতের বিষয় কি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তন হতে থাকে? তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, তোমার কাছে চল্লিশ রুপি থাকলে তা থেকে এক রুপি যাকাত দেয়া তোমার জন্য আবশ্যক, কিন্তু আমার কাছে যদি চল্লিশ রুপি থাকে তাহলে ৪১ রুপি যাকাত হিসেবে দেয়া আবশ্যক কেননা; তোমার পদমর্যাদা এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি উপার্জন কর এবং খাও কিন্তু আমাকে তিনি এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, আমার ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করেন, এখন যদি নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আমি চল্লিশ টাকা জমা করি তাহলে সেই চল্লিশ টাকাও দিতে হবে আর এক রুপি জরিমানাও দিব। অতএব এই ছিল পুণ্যবানদের অবস্থা।

তাই অনেকের জন্য আবশ্যক হলো, সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি মনোযোগী থাকা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার সাধারণ মানুষ জাগতিক আয় উপার্জনও করবেন আর একই সাথে নিজেদের সম্পদ এবং সময়ের কিছু অংশও ব্যয় করবেন এবং ইবাদত ও ধর্মীয় কাজে সময় দিবেন, ইস্তেগফারও করবেন আর দোয়াও করবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেই সম্মান, সম্পত্তি আর খ্যাতি দিয়েছেন এগুলো খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ, তাই এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হলো তা থেকে অন্যদের জন্য ব্যয় করা।

কিছু মানুষ ব্যবসায়িক মনমানসিকতা-সম্পন্ন হয়ে থাকে বা কৃত্রিমভাবে অনুকরণ প্রিয়তার বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করে বসে যা জামাতী রীতিনীতির পরিপন্থী বা ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যহীন। ওহদাদারদের মাঝেও এমন মানুষ রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় আঞ্জুমানও এমন সিদ্ধান্ত করে বসে। কাদিয়ানে একবার স্থানীয় জামাত একটি ফরম ছাপায় এবং অন্যদের কাছে এক আনায় তা বিক্রি করতে আরম্ভ করে, (চার পয়সায় এক আনা হয়)। সম্ভবতঃ রিপোর্ট ফরম এর মত কোন ফরম ছিল সেটি। আজও কিছু মানুষ এ ধরনের অভিনবত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আর নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে যায়।

যাহোক, তখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাদের যেভাবে বুঝিয়েছিলেন তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন, আমি জামাতের সদস্যদের

বলবো,নিজেদের সকল কাজে শরীয়তের শিক্ষা অনুসরণ করুন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য করুন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অনুসরণ করুন। সম্প্রতি আমাকে একটি কাগজ দেখানো হয়েছে। আমি শুধু এটি দেখেছি, এই কাগজটি একটি ফরম-এর মত ছিল, তাতে ফরমের মতই ছক আঁকা ছিল কিন্তু যিনি আমাকে তা দেখিয়েছেন তিনি বলেন, এটি এক আনায় বিক্রি হয় আর জানা গেছে, আমাদের স্থানীয় আঞ্জুমান তা আবিষ্কার করেছে। সরকারী টিকেট বা খাম দেখে তারা ভেবেছে যে, আমরাও একটি কাগজ বানিয়ে এর মূল্য নির্ধারণ করব। বলা হয়, কাক হাঁসের চলন ভঙ্গী অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের চলনভঙ্গিও ভুলে গেছে। আমি এখানে একথা বলব না কিন্তু এটি অবশ্যই বলব হাঁস কাকের ভঙ্গী অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের চালটাও ভুলে গেছে। জাগতিক সরকারের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক যে, আমরা তাদের অনুকরণ করব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমন কোন ফরম কখনও বানান নি। তাই শত্রুকে অনর্থক এ ধরনের আপত্তির সুযোগ দেয়া কোথাকার বুদ্ধিমত্তা। এমন কথার ফলেই শত্রুরা ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ পায় আর বলে, জানা নেই যে, তারা এটি কি করছে। কাজ কোন একজন করে আর দুর্নাম হয় জামাতের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, স্থানীয় কমিটির অবস্থা তেমনই যেভাবে গুরুদাসপুরে এক বয়োঃবৃদ্ধ মানুষ বসবাস করতো। দীর্ঘকায় ছিলো, দীর্ঘ শশ্রুধারী এবং আরযি লেখক ছিলো। তার রীতি ছিল যখনই কোন বন্ধুকে দূর থেকে দেখতো আস্‌সালামুআলাইকুম বলার পরিবর্তে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ধ্বনি উত্তোলন করতো আর কাছে পৌঁছলে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করতো একই সাথে লাফাতে থাকতো।

প্রায় সময় সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে সাক্ষাতের জন্য আসতো। তারও আমাদের স্থানীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর মত অনুকরণের অভ্যাস ছিল। হুযূর এখানে অনুকরণের অভ্যাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, অনেকেই অনুকরণ বশতঃ অন্যায় কাজ করে বসে। সেই ব্যক্তি যেহেতু আদালতে আরযি লেখক ছিলো তাই তার ইচ্ছা ছিল আমিও ম্যাজিস্ট্রেট সাজব, আর ফাইল বা রেকর্ড প্রস্তুত করার নির্দেশ দিব। কিন্তু এই বাসনা যেহেতু পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না তাই ঘরে সে একটি রীতি উদ্ভাবন করে। যেমন লবনের একটি ফাইল প্রস্তুত করে। একইভাবে ঘিয়ের রেকর্ড, মরিচের ফাইল, জ্বালানির ফাইল ইত্যাদি বানিয়ে রেখেছিল। অফিস থেকে যখন ঘরে আসতো তখন সে একটি ঘড়া উল্টিয়ে এর ওপর বসে পড়তো। স্ত্রী লবনের প্রয়োজনের কথা বললে সে স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলতো, রিডার অমুক ফাইল নিয়ে আস, স্ত্রী ফাইল নিয়ে আসলে সেটি পাঠ করার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করতো এবং বলতো, আচ্ছা এতে একথা রেকর্ড করা হোক যে, আমার নির্দেশে এতটা লবন দেয়া হচ্ছে। একদিন সেই বেচারার দুর্ভাগ্যবশত আদালত থেকে কিছু রেকর্ড বা ফাইল চুরি হয়ে যায়। তদন্ত আরম্ভ হয়। তার এক প্রতিবেশীকর্তৃপক্ষকে বলে, সরকার যদি আমাকে পুরস্কার দেয় তাহলে আমি ফাইলের সংবাদ দিতে পারি। তাকে বলা হয়, ঠিক আছে বল।

প্রতিদিন যেহেতু প্রতিবেশীর ঘর থেকে ফাইলের বা রেকর্ডের কথা তার কর্ণগোচর হতো তাই তাৎক্ষণিকভাবে সে সেই বৃদ্ধের কথা উল্লেখ করে। পুলিশ তাদের সকল সাজসরঞ্জামসহতার ঘরের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয়। এরপর যখন ফাইল বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে, কোনটি লবনের, কোনটি ঘি-এর আর কোনটি মরিচের ফাইল বা রেকর্ড ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এই দৃশ্যই আজ আমরা এখানে দেখি, আমাদের বন্ধুরা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জিনিসকে খুবই উত্তম মনে করে এর অনুকরণ আরম্ভ করে। তারা এটি দেখে না যে, এর প্রয়োজন কি? অতএব এখানে কোন ফরম বা এর মূল্যের প্রশ্ন নয় বরং নীতিগত বিষয় হলো, যা আমাদের শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী তা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমতঃ এটি বৈষয়িক কোন অনুকরণ নয় কিন্তু আমাদের যদি কোন ক্ষেত্রে অনুকরণ করতেই হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) হলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর অনুকরণ এবং অনুসরণ করা উচিত বা এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আমাদের সামনে আদর্শ বানিয়েছেন, তিনি তাঁর মনিবের কাছে যা শিখেছেন এবং আমাদেরকে অবহিত করেছেন, সেই অনুসারে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত।

একবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-তাঁর নিজস্ব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছর বা তাঁর তিরোধানের পর প্রথম খিলাফতের কোন রমযান ছিল। যাহোক, গরমকাল হওয়ার কারণে বা সেহরীর সময় পানি পান করতে না পারার কারণে এক রোযায় আমার প্রচন্ড পিপাসা লাগে, এমনকি আমার বেহুশ বা অচেতন হওয়ার মত আশঙ্কা হয় অথচ সূর্য ডুবতে তখনও এক ঘন্টা বাকী ছিল। আমি শ্রান্ত এবং অবসন্ন হয়ে একটি বিছানায় গা এলিয়ে দেই আর দিব্য দর্শনে দেখি, কেউ আমার মুখে পান পুরে দিয়েছে। আমি সেই পান চোষার পর আমার সব পিপাসা দূর হয়ে যায়। কাশ্‌ফের এই অবস্থা কেটে যাওয়ার পর আমি দেখি, পিপাসার নাম চিহ্নও আর অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আমার পিপাসার নিবারণ করেন আর পিপাসা নিবারিত হওয়ার পর পানি পান করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন তখন ছিল যখন পিপাসা লেগেছিল। আসল উদ্দেশ্য হলো চাহিদা পূরণ করা, তা উপযুক্ত উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমেই হোক বা এর প্রতি অনিহা বা ভ্রুক্ষেপহীনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই হোক অর্থাৎ এর চাহিদা উবে যাওয়া। হয় প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার মাধ্যমে অথবা সেই জিনিসের চাহিদা দূর করেই হোক।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এক একজন লিখেন, দোয়া করুন যেন অমুক মহিলার সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমরা দোয়া করব কিন্তু বিয়ের কোন শর্ত থাকবে না, বিয়ে হোক বা তার প্রতি ঘৃণাই জন্মাক না কেন। তিনি (আ.) দোয়া করেন। কয়েক

দিন পর সেই ব্যক্তি লিখেন, আমার হৃদয়ে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে আমাকেও এক ব্যক্তি এমনটি লিখেছে আর আমিও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর রীতি অনুসারে তাকে একই উত্তরই দিয়েছি। সে পরবর্তীতে আমাকে অবহিত করে যে, তার হৃদয় থেকে তার ধারণা উবে যেতে থাকে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা দু'ভাবে সাহায্য করেন। অর্থাৎ আসল বিষয় হলো, যেই জিনিসের বাসনা থাকে সেই বাসনা এবং সেই অভীষ্ট অর্জন হওয়া অথবা পাওয়ার যে বাসনা থাকে সেই বাসনাই মন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কাছে এমনটিই দোয়া করা উচিত। প্রকৃত বিষয় হলো, খোদার সন্তুষ্টি এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে দোয়া করা।

এখনও অনেকেই এভাবে পত্র লিখে যে, আমরা অমুক স্থানে সম্পর্ক করতে চাই, দোয়া করুন যেন এটি হয়ে যায়, আর একই সাথে চেষ্টাও করুন, তার পিতা-মাতাকেও বলুন আর সেই জামাতকেও বলুন, নতুবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব, আমিও মরে যাব আর দ্বিতীয় পক্ষও মরে যাবে। এগুলো সব বাজে কথাবার্তা। বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং বংশ বিস্তার। তাই খোদা তা'লার কাছে তাঁর কৃপার ভিক্ষা চাওয়া উচিত, যদি খোদার দৃষ্টিতে শুভ হয় তাহলে যেন এ সম্পর্ক হয়, নতুবা মন থেকে সেই আকর্ষণ হারিয়ে যায়। এই যে জাগতিক ভালোবাসা তা ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। জাগতিক ভালোবাসাও খোদার ভালোবাসা বা খোদা প্রেমের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। এমনটি যদি হয় তাহলে জাগতিক প্রেম এবং ভালোবাসাও পুণ্যে পর্যবসিত হবে এবং সর্বদা হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হবে বা প্রশান্তি বয়ে আনবে।

এ পৃথিবীর কোন জিনিস নিজ সত্তায় ক্ষতিকর নয় বা নিজ গুণে ক্ষতিকর নয়, এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, 'নাক্সভমিকা'ও একপ্রকার বিষ। এটি খেলে অনেকেই মারা যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে আরোগ্যও লাভ করে অর্থাৎ এটি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে আফিমও অনেক বড় ধ্বংসাত্মক জিনিস কিন্তু এর ধ্বংসের মোকাবিলায় এর উপকারিতা অনেক বেশি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, চিকিৎসকদের প্রশিদ্ধ বচন হলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অর্ধেক ঔষধ এমন রয়েছে যাতে আফিম ব্যবহার করা হয়। আর এর উপকারিতা এত বেশি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। মানুষের যখন উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা থাকে, যখন মানুষের ঘুম উড়ে যায়, ব্যথায় অবসন্ন হয়ে যখন মানুষ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় তখন তাকে মরফিয়া-র ইনজেকশন দেয়া হয় যার ফলে সে তাৎক্ষণিকভাবে আরাম বোধ করে। অতএব পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা নিজ সত্তায় ক্ষতিকর। ক্ষতি শুধু ভ্রান্ত ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রাখে যা মানুষেরই ভুল-ভ্রান্তির ফসল। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) রোগ-বালাইকে নিজের প্রতি আর আরোগ্যকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে একজন মুসলমান আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস রাখার পরও যখন কোন কাজে ব্যর্থ হয় তখন সে বলে বসে, আমি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ব্যর্থ করেছেন, অর্থাৎ সাফল্যের বাহবা সে নিজে নেয় আর ব্যর্থতার জন্য আল্লাহ্ তা'লাকে দায়ী করে।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত বা সত্যিকার মু'মিনের কাজ হলো, কোন কাজের ভালো ফলাফল প্রকাশ পেলে তার আলহামদুলিল্লাহ্ বলা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সফল করেছেন আর কুফল বা ক্ষতিকর ফলাফল সামনে আসলে তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন' পড়া উচিত আর বলা উচিত, আমি আমার অপূর্ণতা আর অক্ষমতার কারণে ব্যর্থ হয়েছি। অপূর্ণতাকে যে ব্যক্তি নিজের প্রতি আরোপ করে এবং সাফল্য পেলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে এমন লোকদের প্রতি খোদা তা'লা কৃপা এবং করুণা করেন আর করুণা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার বান্দা সাফল্যকে আমার প্রতি আরোপ করে, তাই আমি তাকে অধিক সাফল্যে ভূষিত করব।

অনেক সামান্য সামান্য কথাও বড় বড় ফলাফল বয়ে আনে, একথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর এক খুতবায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন মহিলার কাহিনী শোনাতেন। তার একটি মাত্র সন্তান ছিল। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে সে তার মাকে বলে যে, এমন কোন জিনিসের নাম বলুন যা আমি ফিরে আসলে আপনার জন্য যেন তোহ্ফা হিসেবে নিয়ে আসতে পারি আর আপনি তা দেখে যেন আনন্দিত হতে পারেন। মা বলেন, তুমি যদি নিরাপদে ফিরে আস তাহলেএটিই আমার জন্য আনন্দের কারণ হবে। ছেলে জোর দেয় যে, আপনি অবশ্যই এমন কোন জিনিসের কথা বলুন। মা তখন বলেন, ঠিক আছে, যদি কিছু আনতেই চাও তাহলে পোড়া রুটির টুকরো যত বেশি পার নিয়ে এস। তা দেখেই আমি আনন্দিত হতে পারি। ছেলে একে খুবই তুচ্ছ বিষয় মনে করে বলে, আরো কিছু বলুন। মা বলেন, এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করতে পারে। যাহোক, সে চলে যায়। সে যখন রুটি বানাতো তখন ইচ্ছা করে রুটি পুড়ে ফেলত যেন পোড়া রুটির টুকরো বেশি বেশি জমা করা যায়। রুটির কিছু অংশ সে নিজে খেয়ে ফেলত আর পোড়া অংশ একটি থলিতে জমিয়ে রাখতো। কিছুকাল পর ঘরে ফিরে পোড়া রুটির টুকরোর অনেকগুলো থলি সে তার মায়ের সামনে রেখে দেয়। এটি দেখে মা খুবই আনন্দিত হন। সে বলে, মা! আপনার কথার আনুগত্যে আমি এটি করলাম কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না যে, ব্যাপার কী।

মা বলেন, তুমি যখন গিয়েছ তখন এটি বলা যুক্তিযুক্ত ছিল না, তবে এখন বলছি। মানুষের অনেক রোগ আধা-পাকা খাবার খাওয়ার কারণে হয়। তোমাকে পোড়া রুটির টুকরো আনতে বলার কারণ হলো তুমি এই পোড়া টুকরো একত্রিত করার জন্য রুটি ভালভাবে পাকাবে যার ফলে কিছু অংশ পুড়ে যাবে আর তুমি এই জ্বলা অংশ বা পোড়া অংশ রেখে দিবে আর বাকী অংশ খাবে, এর ফলে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আর তাই হয়েছে। এটি বাহ্যতঃ সামান্য একটি কথা। মা যদি ছেলেকে সরাসরি বলতেন, রুটি ভালো করে ভেজে

খাবে তাহলে ছেলে বলতে পারত, আমি একজন যুবক, আমি নির্বোধ নই যে কাঁচা রুটি খাব। হুযূর বলেন, আমি এই যুগেও দেখেছি, অধিকাংশ মানুষ এই নির্বুদ্ধিতার শিকার আর কাঁচা রুটিই তারা বড় আগ্রহের সাথে খেয়ে যাচ্ছে। যাহোক, মায়ের এই কথা সেই ছেলেকে সুস্থ রাখার কারণ হয়েছে।

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার এই অবতরণিকার উদ্দেশ্য হলো, (আসলে খুতবায় তিনি একটি বিষয় বর্ণনা করছিলেন) দোয়া গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করে, ছোট ছোট কথা বলা হয় অথচ এসব কথা পূর্ব থেকেই আমাদের জানা আছে। হুযূর বলেন, জানা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা মেনে চলে না। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দু'টো মৌলিক শর্ত রয়েছে যা স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ফাল ইয়াস তাযিবুলি ওয়াল ইউ'মিনুবি' (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ আমার কথা মানো এবং আমার ওপর ঈমান আনো। এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেমন: দরুদ পড়, সদকা দাও, কিন্তু পবিত্র কুরআন এই দু'টি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ। মানুষ বলে, আমরা জানি। জানা আছে ঠিকই কিন্তু এর ওপর তাদের আমল নেই। অনেকে আমাকে একথাও লেখে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি। এটি খোদার ওপর অপবাদ আরোপ করার নামান্তর। সত্যিকার অর্থে এটি ঈমানের দুর্বলতাও বটে। কিছুকাল পূর্বে একজন আমার কাছে আসে আর বলে, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু তা গৃহীত হয়নি, এর কারণ কি? আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'ফাল ইয়াস তাযিবুলি' অর্থাৎ আমার নির্দেশ মেনে চল, তুমি কি খোদার সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চল? সে বলে, না।

অতএব আমাদেরকে প্রথমে নিজেদের অবস্থা যাচাই করতে হবে যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার কথা মেনে চলছি। এছাড়া 'ইউ'মিনুবি'-র ওপরও মানুষ প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু বাহ্যতঃ দোয়া কবুল হয়নি তাই আমরা মনে করি দোয়া গৃহীত হয়নি, আর তাই ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে। অতএব হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত ঈমান থাকা উচিত, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, দুর্বলতা নিজের প্রতি আরোপ করুন আর সাফল্য খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করুন। এমনটি হলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা আমার কাছে আশা রাখে যে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ এবং কবুল করেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার তৌফিক দিন, আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন, আর আমাদের দোয়াকে গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা দান করুন।

নামাযের পর এক ভাই-এর গায়েবানা জানাযা পড়াব। গ্লাসগোর সৈয়দ আসাদুল ইসলাম শাহ্ সাহেবের জানাযা এটি, যিনি সৈয়দ নঈম শাহ্ সাহেবের পুত্র। তার দাদা এবং এই পরিবার জামাতের বড়ই নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ সেবক একটি পরিবার। ২০১৬ সনের ২৪শে মার্চ ৪০ বছর বয়সে এক দুষ্কৃতকারীর হামলায়তিনি ইন্তেকাল করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন'। ২৪শে মার্চ তারিখে গ্লাসগোতে তাকে তার দোকানের বাইরে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে তাকে হাসপাতাল নেয়া হয় কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। আহমদী হওয়ার কারণে তাকে শহীদ করা হয়েছে এবং তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আর শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন। প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান তার প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়েছে। সরকারের কাজ হলো, এসব কট্টরপন্থী বা উগ্রপন্থীদের প্রতিহত করা। নতুবা এখানেও যদি মৌলভীদের লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা এদেশেও সেসব নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে যা অন্যান্য মুসলমান দেশে এরা সৃষ্টি করে রেখেছে।

মরহুম ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারিতে রাবওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নুসরত জাঁহা একাডেমি থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে ১৯৯৮ সনে গ্লাসগো চলে আসেন এবং তার পিতার সাথে ব্যবসায় যোগ দেন। তিনি ওসীয়্যতও করেছেন, রীতিমত চাঁদাও দিতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিপোর্ট অনুসারে রীতিমত খোদ্দামুল আহমদীয়ার কার্যক্রমে অংশ নিতেন, ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করতেন, চাঁদাও দিতেন, রীতিমত জুমুআর নামাযে আসতেন। অধিকাংশ ইজতেমায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। মরহুম আসাদ শাহ্ সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের পেনশনার ডাক্তার নাসিরুদ্দীন কৃমর সাহেবের জামাতা ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ মাঝে মাঝে তিনি মনস্তাত্ত্বিক রোগের শিকার চলে আসছেন।

যাহোক রিজিওনাল আমীর সাহেব জানিয়েছেন, তার সাথে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তিনি খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। অনেকের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, তিনি হয়তো জামাত ছেড়ে দিয়েছেন, একথা সঠিক নয়। তিনি আহমদী ছিলেন এবং আহমদীয়াতের কারণেই শাহাদত বরণ করেন আর শেষ পর্যন্ত রীতিমত খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছিলেন।

কাবাবীরের মুরুব্বী শামসুদ্দিন সাহেব লিখেন, আসাদ সাহেব-এর স্ত্রী তৈয়্যেবা সাহেবার সম্পর্ক কাদিয়ানের সাথে। শামসুদ্দিন সাহেবের স্ত্রীর চাচাত বোন তিনি। ইনি বলছেন, কয়েক বছর পূর্বে এই অধম দু'বার তার ঘরে যাওয়ার সুযোগ পায়। এক রাতে সেখানে অবস্থানেরও সুযোগ হয়। উভয়বার এই অধমের কাছে জামাতী এবং তবলীগি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। কোন জাগতিক কথাবার্তা হয় নি। উভয় রাতে আমি তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি মাগফিরাত করুন আর তার নিকটাত্মীয়, তার পিতা-মাতা এবং স্ত্রীকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন। নামাযের পর যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৯তম কিস্তি)

অতএব অবস্থা যখন এমনটিই, তখন উলামার জন্য আর আশঙ্কাই বা কী রইলো? হয়তো (জাগতিক অর্থে) তাঁদের এই বাসনাটিও পুরো হয়ে যেতে পারে।

তবে তাঁদের ঐ বিশেষ মনোবাঞ্ছাটি যে তারা কোনো দিন হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবেন তা পুরো হওয়ার কোনো আশা বা সম্ভাবনা কোনো দিক দিয়েই আমি দেখতে পাই না– কাশ্‌ফ ও ইলহামের দিক দিয়েও না, যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারেও না এবং কুরআন করীম অনুযায়ীও খুঁজে পাই না। তাদের এ কথায় জেদ করা যে তারা কেবল তখনই মানবেন, তখনই ঈমান আনবেন যখন তারা হযরত মসীহ্ (আ.)কে আকাশ থেকে নামতে দেখবেন, এটা প্রকৃতপক্ষেই এক মারাত্মক হঠকারিতা। তাদের এ কথাটি ঐসব লোকের কথার সাথে মিলে যায় যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন ঃ "হাত্তা নারাল্লাহা জাহ্‌রাতান" অর্থাৎ 'দৃশ্যত আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত আমরা তোমার কথা মানবো না, ঈমান আনবো না' (সূরা বাকারাহ্ ঃ ৫৬) – বাক্যটি তারা বলতে থাকে। আর তাই ঈমান আনায় তারা বঞ্চিত হয়।

এখন আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে আমার প্রিয় ও সম্মানিত উলামার পরম হিতাকাঙ্ক্ষায় তাদের সমীপে 'সহীহাইন' (তথা বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত সেইসব হাদীস উপস্থাপন করতে চাই যেগুলোর সম্পর্কে তাদের ধারণা যে, এগুলো থেকে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বিশদভাবে প্রমাণিত হয়। আর এ হাদীসগুলোর ওপর ভর করে ও জোর দিয়েই তারা বার বার বলছেন যে, এ সকল হাদীস অনুযায়ী তারা তাদের দাবীর সপক্ষে ডিক্রি পেয়েছেন। অতএব এ হাদীস সমূহ অনুবাদসহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

والذى نفسى بيده ليوشكنّ ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ـ كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم امامكم منكم

(সহীহ বুখারী পৃষ্ঠা নং-৪৯০)। অর্থাৎ, "কসম সেই মহান আল্লাহ্‌র যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের মাঝে ইবনে-মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। তিনি তোমাদের সকল বিবদমান বিষয়ে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মীমাংসা করে দেবেন এবং মিথ্যার সমর্থনকারী ও সত্যের অনুসারীদের মাঝে স্পষ্টাকারে পার্থক্য সাব্যস্ত করে দেখাবেন। অতএব তিনি এই ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী হওয়ার দরুনই ক্রুশভঙ্গ করবেন ও শুকর বধ করবেন এবং প্রতিদিনের লড়াই-ঝগড়ার অবসান ঘটাবেন। তোমাদের সেদিন কী অবস্থা হবে যেদিন তোমাদের মাঝে ইব্‌নে-মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন? তোমরা কি জান, কে এই ইবনে-মরিয়ম? তিনি তোমাদেরই একজন ইমাম (নেতা) হবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকেই (হে আমার উম্মতগণ!) তিনি পয়দা হবেন।"

বুখারী বর্ণিত হাদীসটির অনুবাদ এখন শেষ হলো। এথেকে আপনারা অবশ্যই বুঝে গেছেন যে ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীসটিতে 'ইমামুকুম মিনকুম' বাক্যটি কোন্ দিকে ইঙ্গিত করছে। 'আল-আকিলু তাকফীহিল্-ইশারাহ্' (-বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট)। এরপর সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত হাদীসের অনুবাদ মনোনিবেশে শোনুন।

অর্থাৎ, নোওয়াস-বিন-সামআম* (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাজ্জালের উল্লেখ করে বলেন, 'আমার জীবদ্দশায় যদি দাজ্জাল বের হয় তাহলে আমি তোমাদের সামনে তার সঙ্গে (যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে) লড়বো। (সহীহ মুসলিম)

[এ বাক্যটি বস্তুত পরবর্তীকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ 'দাজ্জাল অবশ্য-

* টীকা ঃ এ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন নোওয়াস বিন-সামআন। অন্য কেউ আর রেওয়ায়াতকারী নেই। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ রিওয়ায়াত বা হাদীসটির সম্পর্কে সাহাবা কিরামের 'ইজমা' (সর্বসম্মত ঐক্যমত্য) রয়েছে বলে (উলামা কর্তৃক) ধারণা করা হয়। অথচ অচিরেই জানা যাবে যে, এটি অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থী।

অবশ্যই মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালে বের হবে' (হাদীসের বর্ণনাটিকে)– দুর্বল করে দিচ্ছে। বরং এ থেকে জানা যায় যে, দাজ্জালের বের হবার জন্য কোনো সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ কারণেই তো স্বয়ং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (নিজ জীবদ্দশায়) ইবনে-সাইয়াদ সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, সে-ই দাজ্জাল। তখন হযরত মসীহ্ কোথায় ছিলেন?]।

এরপর তিনি (সা.) বলেন, 'দাজ্জাল যদি বের হয়, আর তখন আমি না থাকি তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে দাজ্জালের সঙ্গে লড়বে অর্থাৎ যৌক্তিক ও কুরআনিক দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করবে।' আরও বলেন, 'আমার পরে (বা অবর্তমানে) খোদা তা'লা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হবেন।' আরও বলেন, 'তার কোঁকড়ানো চুল হবে এবং ফোলা ফোলা চোখ হবে। আমি যেন 'কা-আন্নি'- (কাশফি অবস্থায়) তাকে আব্দুল-উয্যা-বিন-কুত্নের সাথে তুলনা করি।'

ব্যাখ্যা

মোল্লা (ইমাম) আলী ক্বারী লিখেছেন, "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে বা কাশ্ফের অবস্থায় দেখেছিলেন। আর এটি যেহেতু সাদৃশ্যমূলক রূপকাশ্রীত এক জগত, সেহেতু দাজ্জালের হুলিয়া ও অবয়ব বর্ণনা করার সময় 'কা-আন্নি' অর্থাৎ 'যেন আমি' শব্দটি দ্বারা বাত্লিয়ে দেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ দৃশ্য বা দর্শন সত্যিকার (আক্ষরিক) দৃশ্য বা দর্শন নয়। বরং এটি এক ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বিষয়।' আমি বলছি 'সিহাহ্ সিত্তা'য় (প্রসিদ্ধ ছয়টি সহীহ্ হাদীস-গ্রন্থে) বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস উক্ত বিষয়েরই অকাট্য ও সুনিশ্চিত প্রমাণ বহন করে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা (আ.) ও দাজ্জাল সম্পর্কিত যে-সব বিষয় জ্ঞাত হয়েছিলেন তা সবই নবী (সা.)-এর কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন লব্ধ ছিল, যা নিজ নিজ জায়গায় সমীচীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত দামেস্ক সম্পর্কিত হাদীটিও (যা এখন আমরা অনুবাদ করছি) উক্ত শ্রেণীর হাদীসেরই অন্তর্গত। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন বিশেষ এবং 'রুইয়া সালেহা' বা সত্য স্বপ্নের অন্তর্নিহিত বিবিধ কারণ ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আমার উক্ত বর্ণনার সপক্ষে জোরালো ও সবাক সাক্ষ্যরূপে রয়েছে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী সংবলিত হাদীসসমূহ। যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে লিপিবদ্ধ নিম্নরূপ হাদীসটি ঃ

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ্-বিন-উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'আজকের রাতে স্বপ্নে বা কাশফে তথা দিব্যদর্শনে আমি নিজেকে খানা-কা'বার কাছে দেখতে পাই। সেখানে গোধূম বর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তার গায়ের রং গোধূম বর্ণের মানুষদের মধ্যে উত্তম শ্রেণীর বলে প্রতীয়মান হলো। তাঁর মাথার চুলগুলো থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছিল। আমি দেখি, তিনি দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে খানা কা'বার তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে এই ব্যক্তি?' আমাকে বলা হলো, 'ইনি মসীহ্-ইবনে মরিয়ম'। এরপর একই স্বপ্নে আমি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যার চুলগুলো বাঁকানো ছিল এবং ডান চোখে অন্ধ। এমন যেন তার এ চোখটি আঙ্গুরের মতো ফোলাও জ্যোতিবিহীন। সে দেখতে অনেকটা ঐসব লোকের মতো ছিল যাদের আমি ইব্নে-কুতনের সঙ্গে দেখেছি। তার উভয় হাত দু'জন ব্যক্তির কাঁধে রাখা ছিল। আর সে খানা কা'বার তাওয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে এই ব্যক্তি?' মানুষজন বললো, 'এ হচ্ছে দাজ্জাল।' (রূহানী খাযায়িন জিল্দ-৩, পৃ. ২০০)

এখন হাদীসটিতে সার্বিক দৃষ্টিপাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, দামেস্ক সম্পর্কিত সহীহ্ মুসলিমের হাদীসটিতে বর্ণিত বিষয়গুলোর বেশির ভাগ কথাই এ হাদীসটিতেও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বিশদ ভাবে এ হাদীসটিতে জানিয়ে দিয়েছেন যে এটি তাঁর কাশ্ফ (দিব্য দর্শন) বা স্বপ্ন যোগে দেখানো বিষয়। অতএব এ জায়গা থেকে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, দামেস্ক সংক্রান্ত যে হাদীসটি আমরা লিখে এসেছি সেটিও প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি স্বপ্নেরই বিবরণ। যেমন, সেখানে 'কা-আন্নি' (যেন আমি) শব্দটি বর্ণনা করে এরই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আর এ হাদীসটিতে স্বয়ং মহানবী (সা.) সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে এটি তাঁর এক কাশ্ফ বা স্বপ্ন। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে তাঁদের প্রণীত সহীহ্ হাদীস-গ্রন্থদ্বয়ে লিখেছেন এবং বিজ্ঞ আলেমগণ এতে বর্ণিত একটি জটিলতা তুলে ধরে তার জবাব বা সমাধান উপস্থাপন করেছেন। এই সমাধান মূলক বিষয়টি আমার দাবী বা বক্তব্যের স্বপক্ষে এমন জোরালো সমর্থন যোগায় যে আমার এবং আমার বিরুদ্ধবাদীদের মাঝে এটি যেন চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসাকারী এক প্রমাণ বিশেষ। অতএব বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত এ হাদীসটিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকে খানা-কা'বার তাওয়াফ করতে দেখলাম।' এরপর তিনি (সা.) বলেন, 'তেমনিভাবে দাজ্জালকেও খানা-কা'বার তাওয়াফ করতে দেখলাম।' এ বর্ণনা থেকে মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম এবং দাজ্জালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন আবশ্যকীয় ভাবে এক ও অভিন্ন এবং তারা উভয়ে সিরাতে-মুস্তাকীমে পরিচালিত ও ইসলামের সত্যিকার অনুসারী বলেই প্রতীয়মান হয়। অথচ অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, দাজ্জাল খোদা হওয়ার দাবী করবে।

অতএব তার আবার খানা-কা'বার তাওয়াফের সাথে কী সংশ্রব? (অতীত কালের) বিজ্ঞ উলামা এর জবাব দিয়েছেন ঃ "এ ধরনের কথা ও শব্দাবলী বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা মহা ভুল। এসব তো প্রকৃতপক্ষে কাশ্ফ ও সত্য স্বপ্নের ধারায় বর্ণনা বিশেষ। এগুলোর তা'বির ও ব্যাখ্যা করা উচিত। যেমন কিনা সাধারণ অর্থেই স্বপ্নের তা'বির (ব্যাখ্যা) করা হয়। অতএব এর তা'বির হচ্ছে, অভিধানে 'তাওয়াফ' প্রদক্ষিণ করাকে বলা হয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর 'নযুল' বা অবতরণের সময়কালে দ্বীনে-ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর কর্ম-প্রয়াসের চারদিক ঘুরবেন (তথা প্রদক্ষিণ করবেন) এবং এ কাজের পরিপূর্ণ সমাধা লাভের

জন্য আগ্রহী হবেন। তেমনি দাজ্জালও তার 'খুরূজ' তথা বের হওয়ার সময়কালে তার ফেৎনা-ফাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির কর্ম-প্রয়াসের চরদিক ঘুরবে এবং তা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য প্রত্যাশী হবে।"

এখন কোথায় ঐ সকল স্বনামধন্য মৌলবী সাহেবান যাঁরা এ হাদীস সমূহের শব্দাবলীকে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে চান এবং এ গুলোর বাহ্যিক বর্ণনা থেকে সমীচীন ও যথার্থ অর্থে আবশ্যকীয় পরিবর্তনকে কুফর ও 'ইলহাদ' (অধার্মিকতা ও নাস্তিক্য) বলে গণ্য করেন? তাঁরা বরং নিজ বক্ষস্থ বিবেক-দর্পণে একটু তাকিয়ে দেখুন, অতীকালের বিজ্ঞ বুযুর্গানে-দ্বীন এ হাদীসটির অর্থ করতে গিয়ে দাজ্জালের তাওয়াফ করাকে একটি স্বপ্নের ব্যাপার মনে করে কীরূপ এর তা'বির ও ব্যাখ্যা করেছেন, যা বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে অনেক দূরে। কাজেই অনুপায় হয়ে যখন এ সকল কাশ্‌ফের তা'বির ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তখন কী কারণে যথার্থ ও জোরালো হেতু ও প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য অংশেরও ব্যাখ্যা করা হবে না?!

জানা আবশ্যক, যেমন আমাদের (অতীত কালের বিজ্ঞ) উলামা দাজ্জালের তাওয়াফ করাকে একটি কাশ্‌ফ সংশ্লিষ্ট বিষয় মনে করে এর এক আধ্যাত্মিক তা'বির (তথা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা) করেছেন, অনুরূপ ভাবে স্বয়ং আমাদের মহানবী 'খাতামুন্নবীয়িন' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (হাদীসাবলীর) কতক জায়গায় ব্যক্ত করেছেন যে, কাশ্‌ফ বা দিব্য-দর্শন মূলে তাঁর প্রতি যা-কিছু উন্মোচিত করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এর চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত অর্থ জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে তিনি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ এ হাদীসটি দেখুন যা সহীহ্ বুখারীর ৫৫১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ

عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم
قال لها اريتک فى المنام مرتين
ارىٰ انک فى سرقة من حرير و يقول هٰذه
امرأتک فاكشف عنها فاذا هى انت فاقول
ان يک هذا من عند الله يمضه

(রূহানী খাযায়েন পৃঃ ২০৩, ২০৪)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাকে স্বপ্নে আমায় দু'বার দেখানো হয়। আমি তোমাকে রেশমের এক টুকরা কাপড়ের ওপর দেখতে পাই। আমাকে বলা হয়, 'ইনি তোমার স্ত্রী।' আমি সেটি খুলি। তখন দেখতে পাই যে, সেটি তুমিই। আর আমি তখন বলি, 'খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই যদি এর তা'বীর (প্রকৃত ব্যাখ্যা) হয়ে থাকে যা আমি বুঝতে পেরেছি, তাহলে এটি এভাবেই ফলবে, বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-এর তা'বির বাহ্যিক ও আক্ষরিকভাবে পুরো হওয়া জরুরী নয়। কখনও বাহ্যিকরূপেও পুরো হয়। আর কখনও অবাহ্যিক রূপেও হয়। অতএব এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বপ্নের সত্যতা ও যথার্থতায় সন্দেহ করেন নি। কেননা নবীর স্বপ্নও এক প্রকারের ওহী (ঐশীবাণী) হয়ে থাকে। বরং এর পূর্ণতার ধরণ সম্পর্কে সংশয় ব্যক্ত করেছেন– খোদা জানেন এটি কি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে পুরো হবে না-কি এর অন্য কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উদ্ভব হবে।

এক্ষেত্রে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বর্ণনা থেকে এ বিষয়টিও বিশদভাবে প্রতীয়মান হলো যে, কাশ্‌ফ বা স্বপ্নের মাধ্যমে নবীর প্রতি যে ওহী ও ইলহাম (ঐশীবাণী) হয়ে থাকে সেটির তা'বির করার ক্ষেত্রেও ভুল হতে পারে। সহীহ্ বুখারীর একই ৫৫১ পৃষ্ঠায় অন্য একটি হাদীসে এ রকম ভুল হওয়ার সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যক্ত করেছেন। সে হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

قال ابو موسٰى عن النبى صلى الله عليه
وسلم رأيت فى المنام انى اهاجر من مكّة
الٰى ارض بها نخل فذهب وهلى الٰى انها
اليمامة او هجر فاذا هى المدينة يثرب

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৩, পৃঃ ২০৪)

অর্থাৎ আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মক্কা থেকে এমন এক জায়গার দিকে হিজরত করেছি যেখানে প্রচুর খিজুর বৃক্ষ রয়েছে। অতএব আমার তখন ধারণা হলো যে, সেটি 'ইমামা' বা 'হিজর' হবে। কিন্তু পরিশেষে বাস্তবতঃ সেটি সাব্যস্ত হলো মদীনা, যাকে 'ইয়াস্‌রাব'ও বলা হয়।" এ হাদীসটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, কাশ্‌ফমূলক বিষয়াদির তা'বির ও ব্যখ্যার ক্ষেত্রে নবীরও ভুল হতে পারে।

এ হাদীস সমূহ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম ও দাজ্জাল সম্পর্কে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো সবই নবুওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন বিশেষ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহে বিশদভাবে এ কথার দিকেও স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, এ কাশ্‌ফগুলোকে কেবল বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বসো না। এগুলোর রূহানী ও তাত্ত্বিক তা'বির ও ব্যাখ্যা রয়েছে। এসব বিষয় অধিকাংশই আধ্যাত্মিক, যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, আমাদের সাম্প্রতিককালের আলেম-উলামা আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুবর্তিতা করতে চান না। আর খামোখা কাশ্‌ফের রূপকাশ্রিত বিষয়াদিকে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে চান।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা যাদের বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

বুলবুল আহমদ
মোবাইল : ০১৯১২ ৭২৪৭৬৯

জুমুআর খুতবা

ইসলামী পর্দা এবং সন্তানদের তরবিয়ত-এর রীতি

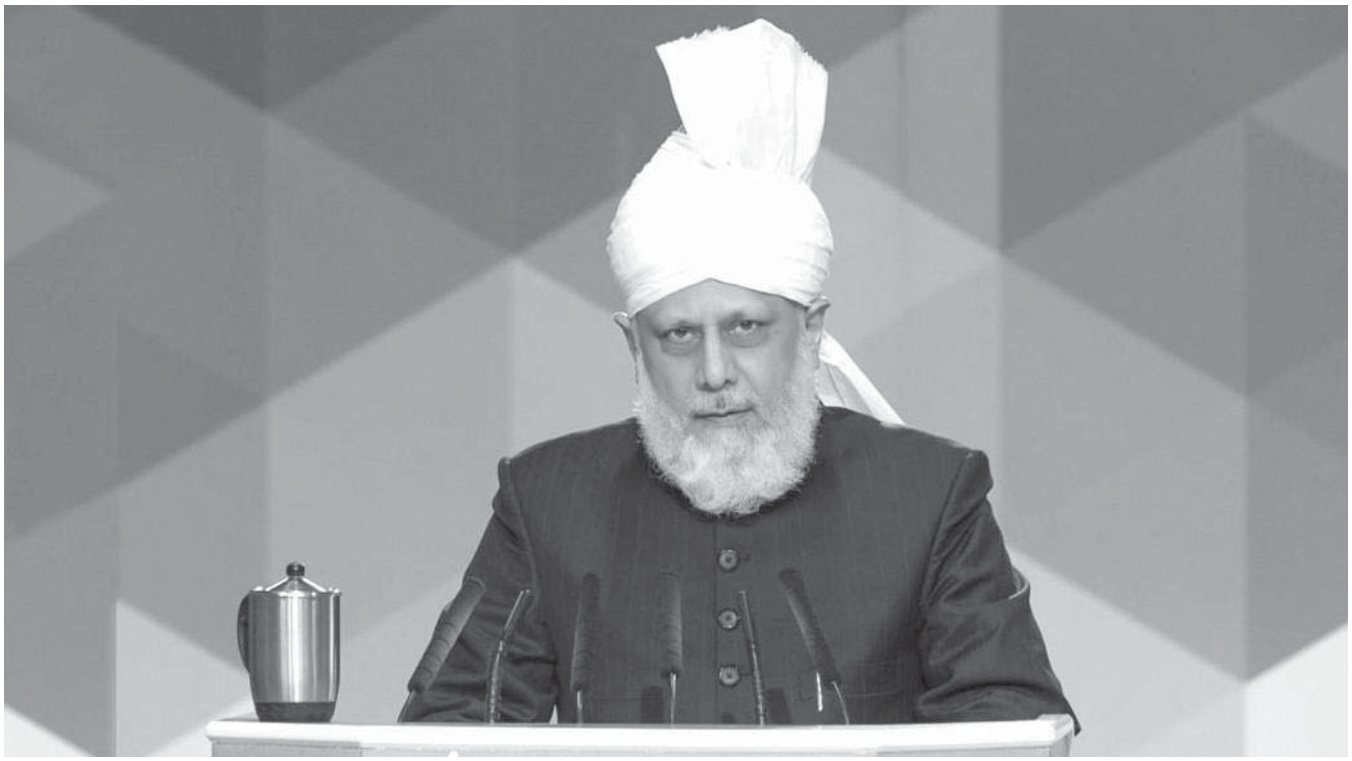

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পিতামাতারা অনেক সময় কোন কাজের কারণে সন্তান-সন্ততিদের কঠোরভাবে ভৎর্সনা করে বা খুবই কঠোর হাতে তাদেরকে ধৃত করে। অনেকেই আবার সন্তান-সন্ততির ভুল-ভ্রান্তিকে এতটাই উপেক্ষা করে যে, সন্তানদের মধ্য হতে ভালো-মন্দের পার্থক্য শক্তিই হারিয়ে যায়। এই উভয় প্রকার আচরণই সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত বা শিক্ষার ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব ফেলে। অতি কঠোর ব্যবহার, কথায় কথায় বিনা কারণে বা যুক্তি প্রমাণ ছাড়া বাধা দেয়া বাচ্চাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে আর একারণে বয়সের একটি সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর তারা আর বৈধ কথার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না।

অনুরূপভাবে সকল বিষয়ে বাচ্চাদের পক্ষপাতিত্ব করাও তরবিয়তের ওপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে এমন বয়সের সন্তান-সন্ততির ওপর যারা শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে। পিতামাতার এই আচরণ বিশেষ করে পিতার এরূপ আচরণ তাদেরকে নষ্ট করে। অতএব এমন বয়সে সন্তান-সন্ততিদের বোঝানোর জন্য যুক্তি এবং প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলা উচিত। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন কিনা সন্তানদের ওপর কেবল তাদের সীমিত পরিবেশেরই প্রভাব পড়ছে না বরং পুরো দেশ বরং সারা পৃথিবীর পরিবেশের তাদের ওপর প্রভাব পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে কোথায় নমনীয়

হতে হবে, কোথায় কঠোর হতে হবে আর কীভাবে বোঝাতে হবে সে বিষয়টি পিতাদের দৃষ্টিগোচর থাকা চাই। এটি পিতাদের দায়িত্ব, তাই শুধু মায়েদের হাতে এটিছেড়ে দেবেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত করার রীতি সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। কোন্ কোন্ জিনিস হালাল বা বৈধ আর কোন্ কোন্ জিনিস তৈয়্যব বা পছন্দনীয় তার বিবরণ তুলে ধরছেন তিনি। তিনি (আ.) বলেন, **"স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, কোন প্রাণী সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন যাদের দেখতে আকর্ষণীয় মনে হয়, কোন প্রাণীকে সুরেলা কণ্ঠের বৈশিষ্ট সহকারে সৃষ্টি করেছেন, কোন প্রাণী খাওয়ার জন্য যার মাংস খুবই সুস্বাদু, কোন প্রাণী ঔষধের জন্য যার মাংসে রোগ-ব্যাধি দূর করার বৈশিষ্ট্য থাকে। শুধুমাত্র হালাল বলেই কোন প্রাণী খাওয়া উচিত নয়। কোন প্রাণীর মাংস হয়ত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে না কিন্তু তা বিভিন্ন ফসল এবং মানুষের মাঝে রোগ-জীবাণু সৃষ্টিকারী পোকামাকড় খেয়ে থাকে।"** তাই কোন কোন পাখি হালাল হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলো শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। পাকিস্তানেও এই বিধিনিষেধ রয়েছে, কেননা সেসব পাখি ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ফেলে।

তিনি (আ.) বলেন, **"এই পাখির মাংস হয়তো হালাল হবে আর পছন্দনীয়ও হবে কিন্তু তা এই পোকা- মাকড় খাওয়ার কারণে মানব জাতির সার্বজনীন কল্যাণের নিরিখে এর মাংস তৈয়্যব থাকবে না বা খাওয়া উচিত হবে না।"** নিঃসন্দেহে তা হালাল এবং পছন্দনীয় কিন্তু তাসত্ত্বেও দেখার বিষয় হলো, অধিক কল্যাণ কোথায় নিহিত। ব্যক্তিগত লাভের ওপর মানব জাতির কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত কেননা; এসব প্রাণী খেয়ে ফেললে মানুষ অন্য অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, শৈশবেই আমাকে এসব কথা শেখানো হয়েছে। শৈশবে একদিন আমি একটি তোতা বা টিয়া পাখি শিকার করে ঘরে নিয়ে আসি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা দেখে বলেন, "মাহমুদ! এর মাংস হারাম বা অবৈধ নয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সব প্রাণী খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। কিছু সুন্দর প্রাণীকে তিনি দেখার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন কেননা, সেগুলো দেখা চোখের জন্য স্নিগ্ধতার কারণ। অনেক প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'লা সুরেলা কণ্ঠ দিয়েছেন যেন তাদের আওয়াজ শুনে শ্রবণেন্দ্রীয় প্রশান্তি বোধ করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রীয় বা অনুভূতির জন্য নিয়ামতরাজি সৃষ্টি করেছেন। সেসব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে কেবল রসনা ও ক্ষুধা চরিতার্থ করলেই চলবে না। অর্থাৎ শুধু জিহ্বার স্বাদ মেটানোর জন্য সব প্রাণী হত্যা করে মাংস খাওয়া আবশ্যক নয় বরং এর অন্যান্য উপকারিতাকেও গুরুত্ব দেয়া উচিত। শুধু খাওয়ার স্বাদ নিলেই চলবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে বলেন, দেখ! এই তোতা পাখি কত সুন্দর প্রাণী, গাছের শাখায় বসে থাকা অবস্থায় দর্শকের কাছে একে কতইনা আকর্ষণীয় দেখাবে।

অতএব তরবীয়তের এই সুন্দর রীতি কেবল হৃদয়কেই বিমোহিত করে না বরং খোদার এই নির্দেশকেও হৃদয়ঙ্গম করায় যে, হালাল বা তৈয়্যব বস্তু খাও কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সাবধানতা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা হালাল এবং তৈয়্যবের নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তৈয়্যবের সংজ্ঞা বদলে যায়। অতএব যেসব প্রাণী বা পাখি অন্যান্য কল্যাণকর কাজে লাগে বা যা অন্যত্র উপকারি সেগুলোর কতক হালাল বা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া তৈয়্যব নয় বা খাওয়া পছন্দনীয় নয় কেননা; সেগুলোর মাংস খাওয়ার চেয়ে অন্যত্র সেগুলো বেশি উপকারি।

এখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণিত আরও কতিপয় ঘটনা উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)পৃথিবী থেকে বিদআত বা ধর্মের শাশ্বতশিক্ষার সাথে যে নতুন সংযোজন হয়েছে সেগুলো দূর করা এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা স্পষ্ট করতে এসেছেন।

অতএব যেখানে এটি তাঁর মিশন বা উদ্দেশ্য সেখানে তাঁর পবিত্র সত্তা কীভাবে কোন প্রকার বিদআত ছড়ানোর কারণ হতে পারে? নাউযুবিল্লাহ্। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের ছবি তুলিয়েছেন বা উঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমীপে যখন তাঁর ছবি সম্বলিত একটি কার্ড বা পোস্ট কার্ড উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি বলেন, এর অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। জামাতকে নির্দেশ দেন, কোন কেউ যেন এমন কার্ড ক্রয় না করে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ পরে আর কেউ এমনটি করার ধৃষ্টতা দেখায়নি। কিন্তু আমি দেখেছি আজকাল পুনরায় কোন কোন স্থানে, টুইটার-এ বা হোয়াট্‌স্ এ্যাপ-এ মানুষ তা ছড়াচ্ছে, পুরোনো কার্ড কোন স্থান থেকে বের করে বা কোন যুগের কার্ড বের করে যা নিজেদের প্রবীনদের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে বা কোন পুরোনো বই পুস্তকের দোকান থেকে কেউ ক্রয় করে এমনটি করছে। এটি একটি ভ্রান্ত রীতি যা বন্ধ হওয়া উচিত।

দূর-দুরান্তের লোকেরা বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা যারা মানুষের চেহারা দেখে চিনতে পারে তারা যেন তাঁর ছবি দেখে সত্য সন্ধান করে এ উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) ছবি উঠিয়েছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কার্ডে ছবি ছাপিয়ে মানুষ সেটিকে ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে কোথাও অবলম্বন না করে বসেবা যখন তাঁর এই আশঙ্কা হলো যে, এর ফলে বিদআতের বিস্তার ঘটতে পারে বা এটি যেন বিদা'তের কারণ না হয় এ এমানসে তিনি কঠোরভাবে এতে বাধা দেন বা বারণ করেন। আর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি একথাও বলেন যে, এগুলো নষ্ট করে ফেলা হোক। অতএব কিছু মানুষ যারা ছবির ব্যবসা করে বা ছবিকে ব্যবসার মাধ্যমে হিসেবে নিয়েছে আর চড়া মূল্য গ্রহণ করে তাদের এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। এছাড়া কিছু এমন মানুষও আছে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবিতে রঙিন ইফেক্ট দেয়ার চেষ্টা করে অথচ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোন রঙিন ছবি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত রীতি, এথেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়া খলীফাদের ছবিরও অনেক ভ্রান্ত ব্যবহার রয়েছে, তা থেকেও বিরত থাকা উচিত।

একবার এক শূরায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সামনে সিনেমা বা চলচ্চিত্র এবং বায়োস্কোপ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয়।

তখন তিনি (রা.) বলেন, এ কথা বলা যে, সিনেমা এবং বায়োস্কোপ এবং ফোনোগ্রাফ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে অপছন্দনীয় –এমনটি সঠিক নয়। স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফোনোগ্রাফ শুনেছেন এবং এর জন্য তিনি নিজে একটি কবিতা লিখেছেন এবং পড়িয়েছেন। এখানকার হিন্দুদের ডেকে তিনি সেই নযম শুনিয়েছেন। সেই নযমের একটি পঙক্তি হলো,

আওয়াজ আ রহী হ্যয়- ইয়ে ফোনোগ্রাফ সে (ফোনোগ্রাফ থেকে এই শব্দ ভেসে আসছে)

ঢুন্‌ডো খুদা কো দিল সে- না লাফ ও গুযাফ সে (খোদা তা'লাকে কেবল বুলি বা দাবি সর্বস্ব নয় বরং আন্তরিকভাবে সন্ধান কর)।

অতএব সিনেমা বা চলচ্চিত্র নিজ বৈশিষ্ট্যে অপছন্দনীয় নয়। অনেকে প্রশ্ন করে, সেখানে যাওয়া অর্থাৎ সিনেমায় যাওয়া পাপ নয় তো? এটি নিজে বা নিজ বৈশিষ্ট্যে অপছন্দনীয় নয় বরং এ যুগে এর যে বিভিন্ন রূপ আছে সেগুলো চরিত্র নষ্ট করে। কোন চলচ্চিত্র যা সম্পূর্ণরূপে তবলীগি এবং শিক্ষামূলক, তাতে তামাশা বা নাটকীয়তার যদি কোন দিক না থাকে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মতামত হলো, তবলীগের ক্ষেত্রেও নাটকীয়তা অবৈধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সামনেও এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, যারা বলে, কোন সময় যদি এমটিএ'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিউজিক অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা ভয়েস অব ইসলাম যে রেডিও চ্যানেল আরম্ভ হয়েছে তাতেও মিউজিক অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই! এসব কথাএবং এসব নতুন সংযোজনকে নির্মূল করার জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছিলেন। তাঁর (আ.) যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের চিন্তাধারার প্রবাহ তার অনুকূলে প্রবাহিত হওয়া উচিত।

নিত্য নতুন আবিষ্কারাদির ব্যবহারঅবৈধ নয় আর এটি বিদআতও নয় কিন্তু এসবের অন্যায় ব্যবহারই এসবকে বিদআতে পর্যবসিত করে। অনেকে এই প্রস্তাবও দেয় যে, তবলীগি এবং তরবিয়তী অনুষ্ঠান সমূহ যদি নাটকের মত করে সাজানো হয় তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে, আপনারা যদি কোন অন্যায় এবং ভ্রান্ত কাজে প্রবেশ করেন বা অনুষ্ঠান মালায় যদি কোন অন্যায় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে কিছুকাল পর শত প্রকার বিদআত আপনাআপনি অনুষ্ঠান মালায় অনুপ্রবেশ করবে। অ-আহমদীদের দৃষ্টিতে হয়তো কুরআন শরীফও মিউজিকের সাথে পড়াবৈধ হতে পারে কিন্তু একজন আহমদীকে বিদআত বা নতুন কথা সংযোজনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। তাই আমাদের এসব এড়িয়ে চলা উচিত এবং এগুলোকে এড়িয়ে চলার অনেক বেশি চেষ্টা করা উচিত।

একজন অ-আহমদী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছে যা একটি চুটকি বা কৌতুকও বটে আর মৌলভী সাহেবের অজ্ঞতাও এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় আর একই সাথে এদের চিন্তাধারার স্বরূপও স্পষ্ট হয়। এরা এসব বিষয়কেও বৈধ মনে করে। লেখক লিখছে, এক জায়গায় এক আরব গায়িকা আরবী গান গাইছিল। সেই মৌলভী সাহেবকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি খুবই তিনি মত্ত হয়ে তা শুনছিলেন আর একই সাথে সুবহানাল্লাহ্, মাশাআল্লাহ্ এবং আল্লাহুআকবরও পড়ে যাচ্ছিলেন। একজন তাকে জিজ্ঞেস করে, মৌলভী সাহেব! আপনি এত দুলছেন কেন বা আন্দোলিত কেন? তিনি বলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, সে কত সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পড়ছে? সেই গান যেহেতু আরবী ভাষায় ছিল তাই তিনি তা কুরআন মনে করে বসেছেন। অতএব বিদআতের প্রসার ঘটলে এভাবে মানুষের চিন্তাধারারও বিকৃতি ঘটে।

এক জায়গায় ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করার সময় মনে করে, আমাদের রোগীদের চিকিৎসার কাজ আমরাই সারতে পারি, অন্য কাউকে দেখানোর প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে ভারতবর্ষে এমনটি হয়ে থাকে আর তারা মনে করে, কারো কোন পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, উপমহাদেশীয় ডাক্তারদের শতকরা ৯৯% এমন যারা অন্যের সাথে পরামর্শ করাকে অসম্মানের কারণ মনে করে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ডাক্তার হাশমতউল্লাহ্ সাহেব, যিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অন্য সব এ্যাসিস্টেন্ট সার্জনদের চেয়ে উত্তম কিন্তু তাসত্ত্বেও এর অর্থ এটি নয় যে, তার পরামর্শ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরও এই রীতিই ছিল আর আমারও একই রীতি। ১৯১৮ সনে যখন আমি অসুস্থ হই তখন ডাক্তার এবং কবিরাজদের একত্রিত করি, ডাক্তারদের ঔষুধও খেতাম আর কবিরাজদেরও কেননা জানা নেই যে, কার দ্বারা আমরা উপকৃত হব। কোন ডাক্তার নিজেকে খোদা মনে করলে করতে পারে কিন্তু আমরা তাকে মানুষই মনে করি। আজকালও কোন কোন ডাক্তার অন্যের চিকিৎসা নিলে রাগ করে। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি রীতি।

অনেক সময় সাধারণ গুল্মলতা দ্বারা ভেষজ চিকিৎসা যারা করে তারা রীতিমত কবিরাজও হয় না কিন্তু তাদের হাতে কিছু ব্যবস্থাপত্র আসে আর তা দিয়ে তারা মানুষের চিকিৎসা করে এবং রোগীর খুবই উন্নত চিকিৎসা করে থাকে। যেখানে অনেক সময় ডাক্তাররাও ব্যর্থ হয়ে যায় আর কোন চিকিৎসা যেখানে কাজে আসে না সেখানে তাদের এই চিকিৎসা, এই গুল্মলতা বা কবিরাজি ঔষধ কাজে লাগে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সৈয়্যদ আহমদ নূর কাবলী সাহেবের নাকে ক্ষত ছিল। তিনি অনেক জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন, লাহোরের মিউ হাসপাতালেও গিয়েছেন, এক্সরে করিয়ে কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করেন? কিন্তু ক্ষত ক্রমশঃ দুরারোগ্য হয়ে উঠে। অবশেষে তিনি পেশওয়ার যান এবং সেখানে একজন নাপিতের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। সেই ব্যক্তি শুধু তিন দিন ঔষধ ব্যবহার করে আর এতেই ক্ষত সেরে যায়।

তিনি (রা.) বলেন, এমন দক্ষ এবং কুশলীরা রয়েছে যারা এমন এমন বিষয় জানেন যে, এগুলোকে যদি ধরে রাখাযায় বা জীবিত রাখা যায়বা তাদের উৎসাহিত করা হয় তাহলে এসব থেকে অনেক নতুন পেশার উদ্ভব ঘটতে পারে। জীবিত রাখার অর্থ হলো, এ সম্পর্কে গবেষণা করা,তাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করা যে তাদের উচিত এই ব্যবস্থাপত্র পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে চলমান রাখা। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে যা হয় তাহলো যারা এর জ্ঞান রাখে তারা এসবকে চলমান রাখার চেষ্টা করে না বা অন্যকে জানানো পছন্দ করে না, তাই তারা উন্নতিও করে না। এদিকে যদি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে এসব থেকে আরও অনেক নিত্য নতুন জ্ঞানের শাখার উন্মেষ ঘটতে পারে।

তিনি (রা.) বলেন, যেমন হাড়ের চিকিৎসাকে নিন। পাহলোয়ান এবং নাপিত হাড় ঠিক করতে পারে। এরফলে পুরোনো ব্যাথা এবং হাড়ের বাঁক দূর করা যেতে পারে। অনেকেই দক্ষ সাজে আর ভালো হাড়ও ভেঙ্গে ফেলে কিন্তু অনেকেই আছে যারা এ বিষয়ে খুবই দক্ষ। অতএব এই জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানের তা বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, অতীতে মানুষ এসব পেশা বা এসব জ্ঞান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে খুবই কার্পণ্য করতো আর কেউ কাউকে বলতো না, এ কারণেই কালের প্রবাহে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেকের বহু প্রাচীন চিকিৎসা বা বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থাপত্র জানা ছিল কিন্তু তারা কাউকে তা বলতো না তাই কালের প্রবাহে তা বিলুপ্তির শিকার হয়েছে। ইউরোপিয়ানরা এমন করে না, তারা তাদের জ্ঞানের প্রসার করে। আর এরফলে তাদের আয়-উপার্জনও বেশি হয়। কিছু ঔষধে প্যাটেন্ট থেকে থাকে অর্থাৎ কিছু কোম্পানির নিজস্ব সত্ত্ব থেকে থাকে।কিছুদিন পর তারা সেই সত্ত্ব প্রত্যাহার করে নেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক নাপিত ছিল যে এমন মলম প্রস্তুত করতে জানতো যা ব্যবহারে অনেক বড় বড় পুরোনো ক্ষত, দুরারোগ্য ক্ষত ভাল হয়ে যেত। মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসতো। তার ছেলে তার কাছে ব্যবস্থাপত্রের কথা জানতে চাইলে সে বলতো, এই বিষয়ে অবগত ব্যক্তি পৃথিবীতে দু'জন হওয়া উচিত নয়। অতএব এটি আমার কাছে আছে, এখানেই থাকবে। সে নিজের ছেলেকেও তা বলেনি। অবশেষে সে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পুত্র তাকে বলে, এখন তো আমাকে জানিয়ে দিন কেননা; জীবনের কোন ভরসা নেই। সে বলে, ঠিক আছে তুমি যদি মনে কর যে, আমি মারা যাচ্ছি তাহলে আস তোমাকে বলছি। কিন্তু এরপর হঠাৎ করে বলে, আমি হয়তো সুস্থ হয়ে উঠব বা আমি আরোগ্যও লাভ করতে পারি তাই সে আর ছেলেকে বলেনি। এর কয়েক ঘন্টা পরই সে ইহধাম ত্যাগ করে। তার ছেলের আর জানা হলো না এবং সেই বিদ্যা সম্পর্কেবিশ্ব অজ্ঞই থেকে গেল। তার ধারণা ছিল, আমি চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত হব কিন্তু পিতার হঠকারিতার কারণে বেচারা অজ্ঞই থেকে গেল। তার পিতাও তার কোন কাজে আসেনি আর তার জ্ঞানও তার কোন কাজে আসলো না।

তিনি বলেন, কার্পণ্য উন্নতির নয় বরং লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার কারণ হয়। তাই এমন বিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা উচিত নয়। জ্ঞানের প্রসার এবংবিস্তারের চেষ্টা থাকা চাই। তিনি বলেন, অনেক সময় এটি (অর্থাৎ এই কার্পণ্য) বংশের ধ্বংস ডেকে আনে। তাই এসব পেশা বা চিকিৎসাবিদ্যা এবং উপজীব্য সম্পর্কে শেখানো কল্যাণকর হয়ে থাকে, এরফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আমি মনে করি হারিয়ে যাওয়া এসবউপজীব্য বা প্রফেশন সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা হওয়া উচিত। অতএব ডাক্তাররা কোনকোন ক্ষেত্রে অহংকারের কারণ হয় বা অহংকার করে আর এই অহংকারের কারণে তারা অন্যের জন্য দুঃখ-কষ্টে ডেকে আনে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা জ্ঞানের অবসান ঘটায় আর পৃথিবী একটি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতএব অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে এটি একটি সাধারণ বা সার্বজনীন সমস্যা। আহমদীয়া জামাতকে সেসব দেশে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন এই অজ্ঞতা দুরীভূত করা সম্ভব হয়।

মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকে আর সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। আবার অনেকেই হয়ে থাকেত্বরাপরায়ণ। দুরভিসন্ধি না থাকলেও তারা আপত্তি করে বসে বা এমনভাবে কথা বলে যাতে আপত্তির দিক থাকে। এমন লোকদের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে একবার এমনই ভিন্ন প্রকৃতির দু'ব্যক্তি এক জায়গায় একত্রিত হয়। ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিলের ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রাককালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ভূমিকম্প সম্পর্কে বহু ইলহাম হয়। ইলহাম হয় যে, ভূমিকম্প আসবে। তিনি খোদার বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে বাগানে আশ্রয় নেন। কতক নির্বোধ তখনও বলে বসতো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্লেগের ভয়ে বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সে যুগে প্লেগেরও প্রাদুর্ভাব হয়েছিল আর ভূমিকম্পও হচ্ছিল। তারা বলে, তিনি প্লেগের ভয়ে বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, কতিপয় আহমদীর মুখেও আমি এ কথা শুনেছি অথচ প্লেগের ভয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখনও তাঁর ঘর ছাড়েন নি।

তখন যেহেতু ভূমিকম্প সম্পর্কে তাঁর প্রতি উপর্যুপরি ইলহাম হচ্ছিল তাই তিনি কিছুদিন বাগানে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন আর অন্যান্য বন্ধুদেরও সেখানে আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। সময় যেহেতু স্বল্প ছিল তাই কিছু মানুষের ব্যবস্থা তাঁবুতে করা হয়, আর কিছু মানুষ ইটের ওপর চাটাই বিছিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে নেয় এভাবে তিনি সবাইকে সাথে রাখেন।

অতএব ত্বরাপরায়ণ প্রকৃতির মানুষ অনেক সময় চিন্তা ভাবনা না করেই আপত্তিকর কথা বলে বসে। এমনটি থেকে বন্ধুদের দূরে থাকা উচিত। খুতবা ইলহামীয়া চলাকালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে যেভাবে দেখেছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আরবী ভাষায় ঈদের খুতবা প্রদানের নির্দেশ দেন আরতাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হবে। তিনি ইতোপূর্বে কখনও আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেন নি।কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা দেওয়ারজন্য আসেন আর বক্তৃতা আরম্ভ করেন, আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে, তাঁর চেহারায় এতটাই দৃষ্টিনন্দন ও জ্যোতির্মন্ডিত অবস্থা বিরাজ করছিল যে, আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো বক্তৃতা শুনি অথচ বয়স কম হওয়ার কারণে আরবীর একটি শব্দও আমার বোধগম্য ছিল না।

খুতবা ইলহামীয়াতে মসীহ্ মওউদের যে

বিজ্ঞাপন রয়েছে তা থেকে এটি স্পষ্ট হয় না যে, মসজিদে মুবারক কোনটি –অর্থাৎ মুসলেহ্ মাওউদকে মানুষ এই প্রশ্ন করে। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খুতবা ইলহামীয়া আনিয়ে সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করেন আর বুঝান যে, এ স্থলে এই মসজিদের কথাই বুঝানো হয়েছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং নির্মাণ করিয়েছেন আর এরপর তিনি নিম্ন লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীন অসুস্থ হয়ে পড়েন, প্রায় ৪০ দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এই মসজিদ সম্পর্কে একটি ইলহাম রয়েছে, প্রকৃত ইলহামটি এ ধরনের,**"মুবারিকুন ওয়া মুবারাকুন ওয়া কুল্লু আমরিন মুবারিকিন ইয়ুজআলু ফিহ্"**। তিনি (আ.) বলেন, এটি যেহেতু এ মসজিদ সংক্রান্ত ইলহাম, তাই চল এই মসজিদে গিয়ে তোমাকে ঔষধ দেই। হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে বা আম্মাজানকে হযরত মসীহ্ মাওউদ মসজিদে গিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর প্রস্তাব করেন, মসজিদে এসে ঔষধ খাওয়ান আর দু'ঘন্টার মধ্যেই হযরত উম্মুল মু'মিনীন সুস্থ হয়ে উঠেন।

ডাক্তারদের ধর্মসেবার দায়িত্ব পালন করা উচিত, এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা থাকা উচিত– এ মর্মে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, অসুস্থ এবং রুগ্ন লোকদের ওপর সত্যের প্রভাব খুব দ্রুত পড়ে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে একজন ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন, আমি ধর্মের কী সেবা করতে পারি, ধর্মের কোন্ খিদমত করব? তিনি (আ.) বলেন, আপনি রোগীদের তবলীগ করুন। অসুস্থ লোকদের হৃদয় যেহেতু খুবই কোমল হয়ে থাকে তাই এটিএকটি সুবর্ণ সুযোগ।

অতএব, বর্তমান যুগের ডাক্তারদের মন-মানসিকতা এমনই হওয়া উচিত। আর এ কথা মেনে চললে জাগতিক আয়-উপার্জনের পাশাপাশি ধর্ম সেবার সুযোগও পাবে আর খোদার কৃপাভাজনও হবে।

আজকাল নারী অধিকারের নামে বা সন্ত্রাসকে নির্মূল করার নামে বা অকারণে ইসলামের ওপর আপত্তি করার মানসে প্রাশ্চাত্যে পর্দার প্রশ্নটি খুবই জোরালো ভাবে উঠানো হয়। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে কোন পরিস্থিতিতে কেমন পর্দা করা উচিতএ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিক তুলে ধরেছেন ।

কুরআনে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়া সম্পর্কে (আল্লাহ্) বলেন, "ইল্লা মা যাহারা মিনহা" "ইল্লা মা যাহারা মিনহা" (সূরা আন্ নূর: ৩২) অর্থাৎ 'যেই সৌন্দর্য আপনা আপনিই প্রকাশ পায়।এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর এ প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যে তফসীর রয়েছে তা তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, "ইল্লা মা যাহারা মিনহা" এর অর্থ হল দেহের সেই অংশ যা আপনা-আপনিই প্রকাশ পায় অর্থাৎ যা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে গোপন রাখা সম্ভব হয় না। সেই বাধ্যবাধকতা গঠনগত হোক অর্থাৎ দৈহিক গঠনের সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।

যেমন মানুষের উচ্চতা এক প্রকার সৌন্দর্য যা গোপন করা অসম্ভব। তাই তা প্রকাশে শরীয়ত বারণ করে না বা রোগ-ব্যাধির দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে। চিকিৎসার জন্য শরীরের কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ ডাক্তারকে যদি দেখাতে হয় তাও কুরআনের শিক্ষা অনুসারে দেখানো বৈধ, বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ পর্যন্তও বলতেন, ডাক্তার কোন মহিলা রোগীর ব্যবস্থাপত্র হিসেবে যদি প্রস্তাব করে যে সে যেন মুখ না ঢাকে। যদি চেহারা আবৃত করে তাহলে তার স্বাস্থ্য হানী ঘটতে পারে। আর ডাক্তার তাকে এদিক সেদিক বা বাইরে ঘোরা-ফেরারও নির্দেশ দিতে পারে। ডাক্তার রোগীকে বলতে পারে যে তুমি যদি মেনে না চল তাহলে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

এমন পরিস্থিতিতে সেই মহিলারমুখ খোলা রেখে চলাফেরা করা বৈধ হবে বরং কোন কোন ফিকাহ্‌বিদদের মতে যদি কোন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হন আর ভালো মহিলা দাঈ পাওয়া না যায় আর ডাক্তার বলে দক্ষ দাঈ না রাখলে জীবন হুমকিগ্রস্ত হতে এমন মহিলা যদি প্রসবের সময় কোন পুরুষ দাঈ এর সাহায্য নেয়, এটিও বৈধ বরং কোন মহিলা পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য না নিয়ে প্রসবের সময় যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে সে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মতই পাপী গণ্য হবে।এমন বাধ্যবাধকতা কাজের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) পূর্বে উদাহরণ দিয়েছেন এবং তার প্রতিই ইঙ্গিত করছেন যে, যেমন আমি কৃষিজীবি পরিবারের মহিলাদেরদৃষ্টান্ত দিয়েছি। তারা যদি কাজ না করে বা কাজে যদি পুরুষদের সাহায্য না করে তাহলে তাদের জীবিকাই নির্বাহ হতে পারে না।এসব কিছুই "ইল্লা মা যাহারা মিনহা"-এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব ইসলাম স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছে আবার বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে, লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি। কিছু বাধ্যবাধকতার কারণেপর্দা শিথিল করার বা পর্দার মান কিছুটা শিথিল করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু একই সাথে অকারণে, অবৈধভাবে ইসলামী নির্দেশকে লঙ্ঘন করতে বারণ করেছে, স্বাধীনতার নামে ইসলামে নির্লজ্জতার কোন অনুমতি নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় জ্ঞান এবং বুৎপত্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মুসলেহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ইসলামী মাসলা-মাসায়েলের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা এবং ধর্মীয় বিষয়ে প্রণিধানের। এগুলোর ভেতর গভীর প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এসব না বুঝবে আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন হয়ে ভ্রষ্টতার শিকার হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার কোন বৈঠকে বলেন, মানুষ যদি তাক্বওয়ার দাবি সমূহ মেনে চলে তাহলে সে শত বিয়ে করতে পারে। এই কথাটি জামাতের একটি পত্রিকায় ছেপে যায় এরপর কানাঘুষা আরম্ভ হয় যে মনে হয় যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো,বিয়ে চারটিই করতে হবে এমন কোন বিধিনিষেধ নেই।

পুরুষরা একথা শুনে হয়তো খুবই আনন্দিত হবেন, কেউ যত ইচ্ছা বা যতটা চায় বিয়ে করতে পারে চারটির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার কোন বিধিনিষেধ নেই। মরহুম হযরত মীর নাসের নওয়াব (রা.) এই বিতর্ক এবং বিতণ্ডা যা বাইরে চলছিল মসীহ্ মাওউদের কর্ণগোচর করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনার একথা বলার পিছনে উদ্দেশ্য কি ছিল? মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার কথা অর্থ হলো যদি এক স্ত্রী মারা যায় বা

কোন কারণে যদি তালাক দিতে হয় মানুষ তার স্থলেও আরেকটি বিয়ে করতে পারে, এভাবে একশত বিয়েও করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডন করেন যা কতেক ধর্ম উপস্থাপন করে। এই কথাটি অন্য প্রেক্ষাপটে হচ্ছিল। কেউ কেউ বলে, হুযূর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন, প্রসঙ্গ না দেখেই মতামত ব্যক্ত করে। কোন কোন ধর্ম অনুসারে সারা জীবন মানুষের দ্বিতীয় বিয়ে করা উচিত নয়! স্ত্রী মারা যাক বা তালাকই হোক না কেন, বিশেষ করে যখন স্ত্রী মারা যায় তখন আর দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না; হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন করেনআর এই প্রেক্ষাপটেই কথা হচ্ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই উক্তি যদি ব্যাখ্যা ছাড়াই থেকে যেত তাহলে কিছুকাল পর এটিই মনে করা হত যে, যত চাও বিয়ে কর আর এটিই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, একমাত্র শর্ত হল তাক্বওয়ার। আজকাল পুরুষরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে, তাক্বওয়ার শর্ত তারা জলাঞ্জলি দেয়, তাক্বওয়ার শর্ত দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। এ সম্পর্কে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে দীর্ঘকাল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বিশ্বাস এমনটিই ছিল যে, চারের অধিক বিয়ে করা বৈধ। সে সময় জামাত যেহেতু ছোট ছিল আর সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে বন্ধুদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ থাকত। এমন বিষয় নিয়ে অনেক দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা হত।সে যুগে কোন একটি সময় এ বিষয়টি অআলোচনায় আসে। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, চার স্ত্রী সংক্রান্ত বা চার বিয়ে সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শরীয়ত থেকে প্রমাণিত নয়।

আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়েত তিনি উপস্থাপন করেন, যাতে লেখা ছিল হযরত ইমাম হাসানের ১৮ বা ১৯টি বিয়ে হয়েছে। সেই বৈঠকে কেউ বলে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি এটি নয়। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ধরে নেন যে, হয়তো তাঁর সামনে বিষয়টির পুরো চিত্র উপস্থাপন করা হয়নি, তাই তিনি কাউকে বলেন, এই বইটি নিয়ে যাও,ইমাম হোসাইন সংক্রান্ত আবু দাউদের এই যে রেওয়ায়েত রয়েছে তা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখাও। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, যিনি বই নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদের কাছে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় আর তিনি গভীর উৎসাহে বগলে বইটি নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কী?

তিনি বলেন, হযরত মৌলভী সাহেব এই উদ্ধৃতিটি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ (রা.) মাওউদ বলেন, তার উৎসাহ, তার আগ্রহ দেখে আমিও সেখানেই উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম, আসলে বিষয়টিও এমনই। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যাওয়ার সময় খুবই হাস্যোৎফুল ছিলেন কিন্তু ফিরে আসার সময় মাথা নিচু করে মনমরা অবস্থায় ফিরে আসেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার? তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন এটি কোথায় লেখা আছে যে, তাঁর সব স্ত্রীরাএকই সময়েই ছিলেন? অতএব বিষয়ের এখানে সুরাহা হয়ে গেল যে চারের অধিক বিয়ে এক সাথে করা যেতে পারে না আর তাও শর্ত সাপেক্ষে আর তাক্বওয়া হল সবচেয়ে বড় শর্ত।

ইমামের ডাকে সাড়া দেয়া সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, ইমামের ডাকের মোকাবিলায় ব্যক্তির আওয়াজ-এর কোন গুরুত্বই নেই, যখনই তোমাদের কানে আল্লাহ্‌র রসূলের আওয়াজ আসে তাৎক্ষণিকভাবে লাব্বায়েক বলা এবং তাবাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ছুটা কেননা; এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত বরং মানুষ তখন নামাযে রত থাকলেও তার জন্য আবশ্যক হবে নামায ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের ডাকে সাড়া দেয়া। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের জামাতে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার এমনই করেছেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ডাক শুনে তাৎক্ষণিকভাবে নামায ছেড়ে দিয়ে তাঁর সমীপে উপস্থিত হন। খুব সম্ভব মীর মেহদী হাসান সাহেব বা মিঞা আব্দুল্লাহ্ সানোরী সাহেবও এমনটিই করেছেন। এই দু'জন ভিন্ন ভিন্ন যুগে এমনটি করেছেন। কেউ কেউ এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই আয়াত পাঠ করেন,

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

(সূরা আন্ নূর: ৬৪) তোমরা রসূলের ডাকাকে তোমাদের একে অপরকে ডাকার ন্যায় মনে করো না।বা একথা ভেবো না যে ডেকেছেন ঠিকই কিন্তু সাড়া দেয়া বা নেয়া দেয়া আমাদের ব্যপার। তোমাদের মাঝে যারা দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিসারে সরে পড়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জানেন। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন ভয় করে, পাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন বিপদ তাদেরকে স্পর্শ না করে বা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের তারা শিকার হয়।

অনুরূপভাবে অন্যত্র এসেছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ

(সূরা আল্ আন্‌ফাল: ২৫) অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে আহ্বান করে।

নবীর ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বরং ঈমানের লক্ষণাবলীর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এসব পুণ্যবানরা বা বুযূর্গগণ যা করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে বৈধ ছিল। নবীর উপস্থিতিতে নামায বা অন্য কোন পুণ্য মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং সব সময় আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা। যার দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনে আমরা দেখতে পাই।

ইসলাম স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছে আবার বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে, লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি। কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে পর্দা শিথিল করার বা পর্দার মান কিছুটা শিথিল করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু একই সাথে অকারণে, অবৈধভাবে ইসলামী নির্দেশকে লঙ্ঘন করতে বারণ করেছে, স্বাধীনতার নামে ইসলামে নির্লজ্জতার কোন অনুমতি নেই।

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনেও তা চোখে পরে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার প্রতি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এটি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (রা.) বলেন, মু'মিন সত্যিকার অর্থে খুব বেশি বুঝানো বা অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা করেন না, তার জন্য ইশারা এবং ইঙ্গিতই যথেষ্ট হয়ে থাকে আর ইঙ্গিত বুঝে সে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যে, অনেকেই তাদের উন্মাদ বলে সন্দেহ করে।

এ জন্য পৃথিবীতে যত মু'মিন অতিবাহিত হয়েছে তাদেরকে মানুষ উন্মাদই আখ্যা দিয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, আমার একজন শিক্ষক ছিলেন, তার নাম ছিল মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ; আল্লাহ্ মাগফেরাত করুন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর এমন মানষিক দুর্বলতা ছিল বা দুর্বলতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তিনি তাঁর প্রেমাস্পদ এবং নিজেকে তাঁর প্রেমিক জ্ঞান করতেন। সেই প্রেমের আতিশয্যে তিনি মনে করতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে প্রতিশ্রুত পুত্র এবং মুসলেহ্ মাওউদ বানিয়ে দিয়েছেন। মসীহ্ মওউদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা বা প্রেম ছিল তাঁর ধারণা ছিল, তিনিই প্রতিশ্রুত পুত্র এবং মুসলেহ মাওউদ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল কথা বলতে বলতে অনেক সময় আবেগের বসেউরুতে সেভাবে হাত মারতেন যা দেখে মনে হত কাউকে ডাকছেন। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এভাবেই আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কিছু বলছিলেন, মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ সাহেব ছুটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে গিয়ে বসে পড়েন, পরে কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি এটি কি করলেন? তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই যে ইঙ্গিত করেছেন সেটি আমার প্রতি ছিল যে, তুমি এগিয়ে আস তাই আমি ছুটে যাই। এই ছিল একপ্রকার উন্মাদনা কিন্তু কোন কোন উন্মাদনা শুভ হয়ে থাকে ।তার এই উন্মাদনা বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়নি বরং ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়েছে।

অতএব পাগলপর প্রেমিক যে ইঙ্গিত তার প্রতি না করা হয় সেটি সম্পর্কেও ধরে নেয় যে, আমার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি (রা.) এই প্রেক্ষাপটে নসীহত করেন আর জামাতের উদ্দেশ্যে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসার দাবি করে তারা সঠিক ইঙ্গিত এবং ইশারা কেন বুঝবে না যা তাদের প্রতি করা হয়েছে। আমাদের জামাতের উন্মাদদের জামাতের প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে তা মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদের মতও কি নয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর উরুতে আস্তে করে হাত মারেন আর এতেই তিনি ধরে নেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে ডাকছেন অথচ এখানে আল্লাহ্ তা'লা অতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন, তার মসীহ্ বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন অথচ আমরা মনোযোগ দেই না। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত আর আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর ইশারা-ইঙ্গিতকে বুঝি এবং অনুধাবন করি।

সব কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, তাঁর নির্দেশের অধীনে থেকে করা উচিত। মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। তিনি (রা.) বলেন, মৌলভী গোলাম আলী সাহেব এক কট্টর ওয়াহাবী ছিলেন।ওয়াহাবীদের ফতওয়া ছিল, ভারতে জুমুআর নামায বৈধ, হানাফিদের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। সে যুগে অদ্ভুদ সব দৃষ্টিভঙ্গি রাখত মানুষ। তারা বলতো, মুসলমান বাদশাহ্ থাকলেই সেখানে জুমুআ পড়া বৈধ হবে। আর জুমুআ যিনি পড়াবেন তিনি মুসলমান কাজী হবেন। যেখানে জুমুআ পড়া হবে তা শহর হওয়া চাই। ভারতে ইংরেজ শাসনের কারণে মুসলমান বাদশাহও ছিল আর কাজীও ছিল না, তাই তারা জুমুআর নামায পড়া বৈধ মনে করত না– এই ছিল তাদের সমস্যা। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফে তারা লেখা দেখত, যখন জুমুআর জন্য ডাকা হয় তাৎক্ষণিকভাবে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে জুমুআর জন্য ধাবিত হও।

একারণে তাদের মনে শান্তি ছিল না । একদিকে মন জুমুআ পড়ার বাসনা রাখতো। অপর দিকে আশঙ্কা ছিল, কোথাও কোন হানাফি মৌলভী না আবার আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া জারি করে বসে। এই উভয় সঙ্কটের কারণে তাদের রীতি ছিল জুমুআর দিন গ্রামে প্রথমে জুমুআ পড়তো এরপর যোহর নামায পড়ে নিত আর মনে করতো, জুমুআ সংক্রান্ত মাসলা যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা নিরাপদ আর যোহর নামায পড়া সংক্রান্ত মাসলা যদি বৈধ হয় তাহলেও আমরা নিরাপদ। একারণে তারা যোহরের নামাযের নাম যোহরের পরিবর্তে

'এহতিয়াতি' রাখত অর্থাৎ সাবধানতাসূচক নামায। আর মনে করত, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের জুমুআর নামাযকে ফেলে দেন তাহলে আমরা যোহরকে তাঁর সামনে উপস্থাপন করব আর যদি যোহর প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে জুমুআকে রেখে দেব। কেউ 'এহতিয়াতি' না পড়লে অর্থাৎ যোহর না পড়লে তাকে ওয়াহাবী মনে করা হত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, একবার আমরা মৌলভী গোলাম আলী সাহেবের সাথে গুরুদাসপুর যাই। পথিমধ্যে জুমুআর সময় হয়ে যায়, আমরা নামায পড়ার জন্য একটি মসজিদে যাই। তার সাধারণ রীতির মিল ছিল ওয়াহাবীদের রীতি-নীতির সাথে, ওয়াহাবীরা হাদীস অনুসারে আমল করা আবশ্যক জ্ঞান করত। তাদের বিশ্বাস হল, মানুষের মুক্তির জন্য মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ আবশ্যক।

বস্তুতঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মৌলভী গোলাম আলী সাহেবের সাথে যান আর জুমুআর নামায পড়েন। মৌলভী গোলাম আলী সাহেব জুমুআর নামায শেষ করার পর যোহরের চার রাকাত নামাযও পড়ে নেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভী সাহেব! জুমুআর নামাযের পর চার রাকাত নামায কোত্থেকে এল? তিনি বলেন, এটি 'এহতিয়াতি' অর্থাৎ সাবধানতাসূচক যোহর পড়লাম, আমি বললাম, মৌলভী সাহেব আপনিতো ওয়াহাবী আর বিশ্বাসগতভাবে আপনি এর বিরোধী। 'এহতিয়াতি'র অর্থ কি? তিনি বলেন, 'এহতিয়াতি' এই অর্থে নয় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জুমুআ গৃহীত হয় না-কি যোহর বরং এটি এই অর্থে যে, মানুষ যেন আমাদের বিরোধিতা না করে–ভয় মানুষের খোদার নয়। সুতরাং অনেকেই মানুষের ভয়ে এমন কাজ করে যেমনটি গোলাম আলী সাহেব করেছে। জুমুআ পড়ছেন বলে তিনি মনে মনে আত্মপ্রসাদ নিলেও মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যোহরের চার রাকাত নামাযও পড়েন।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এক বৈঠকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষ দাঁড়ি কামিয়ে ফেলে। তিনি (আ.) বলেন, **আসল বিষয় হল খোদাপ্রেম। এদের হৃদয়ে যখন খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, নিজ থেকেই এরা আমাদের অনুকরণ আরম্ভ করবে।**

আমরা প্রকৃত অর্থে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা অনুধাবন করব আর সত্যিকার খোদাপ্রেম আমাদের মাঝে সৃষ্টি হবে আর আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী হবে–খোদা করুন যেন এমনটিই হয়।

নামাযের পর এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি জনাব আব্দুন নূর জাবী সাহেবের। যিনি সিরিয়া নিবাসী। তিনি ১৯৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। খুব সম্ভব তাকে সরকারী বাহিনী গ্রেফতার করে। পুরো জীবন বৃত্যান্ত এখানে নেই, আমার সামনে যা লেখা আছে সে অনুসারে কয়েক মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি করেছেন। ২০১৩ সনে ৩১ ডিসেম্বর সরকারী আমলারা তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের কারণ হল, কেউ তার মোবাইল ফোন ধার করে বিদ্রোহীদের ফোন করে। এটি সিরিয়ার পরিস্থিতি যখন খারাপ হওয়া আরম্ভ হয় সে যুগের কথা, তখন কাউকে ফোন ধার দেয়া আপত্তিকর কোন ব্যাপার ছিল না। যাহোক, বিদ্রোহীদের কেউ তার ফোন নিয়ে সাথী সঙ্গীদের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত কথা বলে।সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা ফোনে আঁড়ি পাতে, চেক করে এবং তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, তার ফোন থেকেই ফোন করা হয়েছে।

ধরে নেয়া হয়, বিদ্রোহীদের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। একারণে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যা করা হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট অনুসারে মরহুম গ্রেফতার হওয়ার তৃতীয় দিনে মাথায় মারাত্মক আঘাতের কারণে ইন্তেকাল করেন। সরকারী পুলিশ চরম নির্যাতন করে। বিদ্রোহী এবং সরকারী বাহিনীর অবস্থা অভিন্ন। কিন্তু তার পরিবার তার মৃত্যুর সংবাদ পায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন।

ইনি সালিমুল জাবী সাহেবের পৌত্র ছিলেন। সালিমুল জাবী সাহেব একজন প্রবীণ আহমদী। সালিমুল জাবী সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদের যুগে রাবওয়াও গিয়েছেন, উর্দূ ভাষা খুব ভালো জানেন। মরহুম পরিচিত শ্রেণীর মাঝেএবং নিজের পরিবেশে খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী, ভদ্র ও কোমলমতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কোন কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। স্বাস্থ্যবান এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তার বোন মোহতরমা হেবাতুর রহমান জাবী সাহেবা বলেন, আমার ভাইয়ের জন্মের পূর্বেই মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর ছেলে হয়েছে, তাঁকে বলা হয়েছে, আপনি নূর প্রসব করেছেন। পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে)-এর পক্ষ থেকে তার নামা রাখা হয়েছে আব্দুন নূর। তিনি বলেন, আমার ভাই খুবই অনুগত ও মেধাবী ছিল। সবাই তার মেধা এবং যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করত। তার সাথে আমার শেষ যে কথা হয়েছে তাতে তিনি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বলেন, যদি আমি সত্যবাদী আহমদী হই তাহলে আমাকে অন্যদের ক্ষমা করতেশেখা উচিত।

যাহোক, খোদা তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং দাদাসহ জীবিত সবাইকে ধৈর্য দান করুন। সিরিয়ার পরিস্থিতির জন্য দোয়া করা উচিত। সেখানে সরকারের যুলুম এবং নির্যাতনের কারণেই বিদ্রোহী শক্তি মাথাচারা দিয়েছে। আর উভয় পক্ষইযুলুম এবং নির্যাতনে সীমালঙ্ঘন করছে। তৃতীয় শ্রেণী হল, দায়েশ যারা ইসলামের নামে যুলুম এবং নির্যাতনের বাজার গরম করছে। সেখানে বসবাসকারী যত ভদ্র মানুষ রয়েছে তারা সরকারের হাত থেকেও নিরাপদ নয়, সরকারও একইভাবে অত্যাচারী আর বিদ্রোহী শ্রেণীও একইভাবে যুলুম এবং অত্যাচার করছে। আর ইসলামের নামে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যারা দাবিকারক তারাও একইভাবে যুলুম এবং নির্যাতন করছে আর নিরিহ সাধারণ মানুষ এই যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে আর সেসব আহমদীও যারা কোন দলের অংশ নয়। আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন, এদেশের প্রতি করুণা করুন আর যালেম এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে এই দেশকে সত্বর পরিত্রাণ দিন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

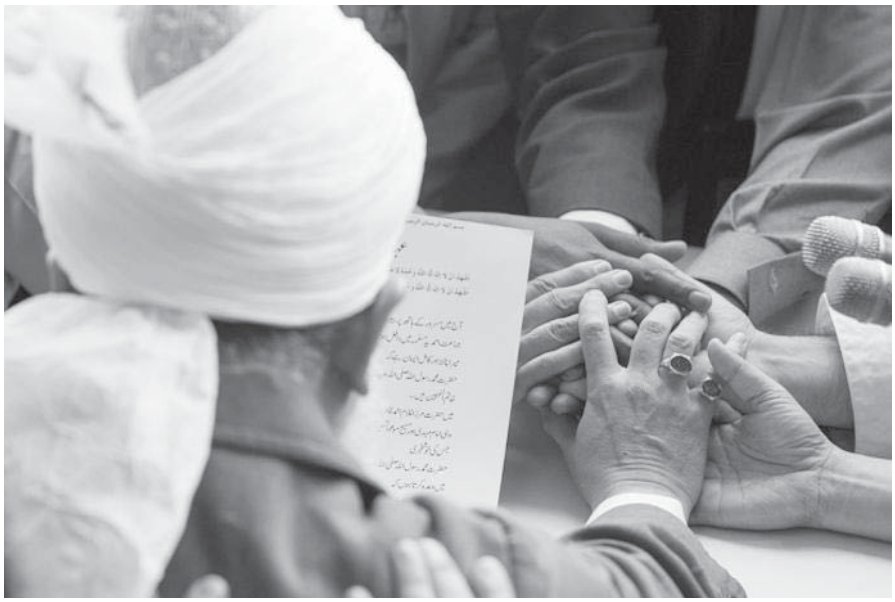

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

****

এই একটি শর্তে যে নয় প্রকারের পাপ উল্লেখিত হয়েছে, প্রত্যেক বয়আতকারীকে-প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে যে নিজে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামাআতে অন্তর্ভুক্তির দাবী করে, তাকে ওই পাপ সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে।

সবচেয়ে বড় পাপ- মিথ্যা

প্রকৃতই সবচেয়ে বড় পাপ হলো মিথ্যা। এ কারণেই কোন ব্যক্তি যখন আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে আবেদন জানালো যে আমাকে এমন কোন উপদেশ দিন যা আমি পালন করতে পারি, কেননা আমার মাঝে বহু পাপাচার বিদ্যমান এবং সে সব পাপ-কর্ম আমি একই সাথে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবো না। তিনি (সা.) বললেন, 'এ প্রতিজ্ঞা করে নাও যে-সর্বদা সর্বাবস্থায় সত্য বলবে, মিথ্যা কখনও বলবে না'। এ কারণে একে একে তার সব দোষত্রুটি ও পাপ দূর হয়ে গেল। কেননা যখনই কোন পাপকর্ম করার ইচ্ছা তার জাগতো সাথে সাথে তার মনে পড়তো যে, ধরা যদি পড়ে যাই তবে আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছে তা উত্থাপিত হবে আর 'মিথ্যা বলবো না' বলে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি। এবারে সঠিক কথা বললে হয় লজ্জিত হতে হবে নয়তো শাস্তি পেতে হবে। এর প্রভাবে ধীরে ধীরে তার যাবতীয় পাপাচার দূর হয়ে গেল। আসলে সকল পাপের মূলই হলো মিথ্যা।

এবারে আমি বিষয়টি খোলাসা করে বর্ণনা করছি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ﴿۳۱﴾

অনুবাদ: আর যে ব্যক্তিই ওইসবের সম্মান করবে যাকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন, তাহলে সেটা তাদের জন্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে উত্তম। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল (বৈধ) করা হয়েছে তবে সেটা ব্যতীত যার উল্লেখ তোমাদের কাছে করা হয়েছে। অতএব প্রতিমা-মূর্তির অপবিত্রতা থেকে নিবৃত্ত হও আর মিথ্যা বলা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হও। (আল হাজ্জ, ২২:৩১) এখানে অংশীবাদীতা (শির্ক)-এর সাথে মিথ্যাকে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'লা আরো বলেন :

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۴﴾

অনুবাদ : সাবধান! প্রকৃত ধর্ম আল্লাহ্‌রই প্রতাপ-মহিমা প্রকাশক হয়ে থাকে আর সেই সব লোক যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের বন্ধু নির্ধারন করে নিয়েছে, (বলে থাকে যে) 'আমরা সেই উদ্দেশ্যেই ইবাদত করি যেন তারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে নৈকট্যের উন্নত মর্যাদার স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়'। নিশ্চয় তদুভয়ের (মধ্যকার বিষয়ে) মীমাংসা

আল্লাহ্-ই করবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করতো। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের হেদায়াত দেন না যারা মিথ্যাবাদী অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। (আয্ যুমার, ৩৯:৪)

সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর ইবনুল আ'স বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির মাঝে চারটি এমন বিষয় রয়েছে যা পরিলক্ষিত হলে সেই ব্যক্তি পাক্কা মুনাফেক সাব্যস্ত হবে। আর যার মাঝে এর কোন একটি দেখা যায় সে ব্যক্তিতে কপটতার স্বভাব বিদ্যমান। কতই না ভালো হতো যদি সে তা পরিত্যাগ করতো।

ক) আলাপচারিতা কালে সে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যখন সে কথাবার্তা বলে তখন তাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলতে থাকে)।

খ) কোন কথা দিলে সে তা রক্ষা করে না, বিশ্বাসঘাতকতা করে।

গ) আর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে অঙ্গীকার সে ভঙ্গ করে। (এটাও এক প্রকার মিথ্যা) এবং

ঘ) ঝগড়া-বিবাদকালে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করে।

এ সবধরনের ক্রিয়া-কর্মই মিথ্যার সাথে সম্পর্কিত।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে:

হযরত ইমাম মালেক (রাহে.) বর্ণনা করেছেন– আমি জানতে পেরেছি যে, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) বলতেন- তোমাদের 'সত্য' অবলম্বন করা উচিত কেননা 'সত্য' সৎকর্মের পথনির্দেশ করে আর সৎকর্ম জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। মিথ্যা থেকে (নিজেকে) রক্ষা করো কেননা মিথ্যা অবাধ্যতার পথে ঠেলে দেয় আর অবাধ্যতা নরকে নিক্ষেপ করে। কী! তোমাদের কি মনে পড়েছে? তোমরা কি জানো না যে বলা হয়ে থাকে- সত্য বলায় সেব্যক্তি অনুগত হয়ে গেলো আর অপর ব্যক্তি মিথ্যা বলে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে ধৃত হলো। [মু'আত্তা' ইমাম মালিক, বাবু 'মাজাআ ফিসসিদক্বে ওয়াল কিযবে']

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল-এ আরও একটি হাদীস আছে:

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি যে ছোট্ট কোন শিশুকে বলে 'এসো, আমি তোমাকে কিছু একটা দিচ্ছি' এরপর সে তাকে কিছুই দেয় না তবে এটি মিথ্যার মাঝে গণ্য হবে। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৯, বৈরুতে মুদ্রিত]

তরবীয়তের জন্য এটা অত্যাবশ্যক। দেখুন! শিশুদের তরবীয়তের জন্য আনন্দ-ফুর্তি উপলক্ষেও এমন কথা বলা অনুচিত। নইলে আনন্দ-ফুর্তির ছলে শিশুদের মধ্যে অসত্য কথনের অভ্যাস গড়ে ওঠে যা ভবিষ্যতে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয় আর এভাবে মিথ্যা বলাটাকে তারা আর দোষের কিছু মনে করে না। ফলে তাদের (মিথ্যা সম্পর্কিত উপলব্ধি ও) চেতনাবোধ লোপ পেয়ে যায়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন– মহানবী (সা.) বলেছেন 'সত্য' সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম জান্নাতে নিয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে সে **'সিদ্দিক'** (সত্যবাদী) লিখিত হয়ে যায়। মিথ্যা, পাপ ও অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় আর অবাধ্যতা নরকে নিক্ষেপ করে আর এভাবে সেই ব্যক্তি যে সর্বদা মিথ্যা বলে থাকে আল্লাহ তা'লার কাছে সে 'চরম মিথ্যাবাদী' হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু কাউলিল্লাহেত তাকুল্লাহে ওয়া কুনু মা আ'স্ সা'দিকিন)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর ইবনুল আ'স বর্ণনা করেন– এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলো আর নিবেদন করলো– হে রসুলুল্লাহ (সা.)! জান্নাতের আমল কী? মহানবী (সা.) বললেন 'সত্য বলা'। কোন বান্দা যখন সত্য বলে তখন সে আনুগত্যকারীতে পরিনত হয় এভাবে আনুগত্যকারী হওয়ার ফলে সে প্রকৃতই মু'মিন হয়ে যায় আর প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পরিনামে সে জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি পুণর্বার নিবেদন করলো, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! দোযখে নিয়ে যায় এমন আমল কোনটি? মহানবী (সা.) বললেন, 'মিথ্যা'! কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলে সে তখন অবাধ্যতা করে আর এভাবে যখন কেউ অবাধ্যতা করে তখন সে কুফর করে এরূপে যখন সে কুফরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় পরিনামে তখন সে নরকে প্রবিষ্ট হয়। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬ বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

"পবিত্র কুরআন শরীফ মিথ্যাকে অপবত্রি ও নোংরা বলে আখ্যায়িত করেছে, যেমনটা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

(সূরা আল হাজ্জ, ২২:৩১)

লক্ষ্য কর! এখানে 'প্রতিমা'র বিপরীতে মিথ্যাকে রাখা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাও এক প্রকার প্রতিমা। নইলে সত্যকে পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে কেনই বা যাবে! যেমনটি প্রতিমার নিয়ন্ত্রণে কোন কিছুই থাকে না, তেমনিভাবে মিথ্যার আওতায় কৃত্রিমতাপূর্ণ জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, মিথ্যাবাদীর প্রতি আস্থা এতটাই হ্রাস পায় যে, যদি সে সত্যও বলে তবুও আশঙ্কা হয় যে, ওতে কোন মিথ্যার সংমিশ্রণ তো নেই! মিথ্যাবাদী প্রকৃতই যদি তার মিথ্যা হ্রাস করতে চায় তবুও খুব শীঘ্রই সে তা পরিত্যাগ করতে পারে না। এক সময় সীমা পর্যন্ত সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টা চালানোর পর সত্য বলার অভ্যাস তার মাঝে গড়ে উঠে। (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫০)

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন:

"মানুষের স্বভাবজাত অবস্থাসমূহের মধ্যে সত্যবাদিতা তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তিমূলক কোন স্বার্থবোধ তাকে প্ররোচনা না যোগায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলতে চায় না এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতে হৃদয়ে এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ বোধ করে। এ কারণেই যে ব্যক্তির মিথ্যাচার প্রমাণিত

হয়, মানুষ তার প্রতি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু স্বভাবজ এ অবস্থা নৈতিকতার পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা শিশু ও পাগলের মাঝেও এটা পরিলক্ষিত হতে পারে। সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত মানুষ হীন বাসনার জলাঞ্জলি না দেয় যা তার সত্যবাদিতায় বাধা জন্মায়, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। কারণ মানুষ যদি কেবল এমন সব বিষয়ে সত্য কথা বলে যাতে তার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু মানসম্ভ্রম বিপন্ন হলে বা ধন-সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা বলে ফেলে এবং সত্য বলা থেকে বিরত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পাগল ও শিশু অপেক্ষা তার শ্রেষ্ঠত্ব রইলো কী! পাগল ও নাবালক শিশু কি এই প্রকার সত্য বলে না? পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কেউই নেই, যে কোন প্ররোচণা ছাড়া অকারনে মিথ্যা বলে। অতএব, যে সত্যবাদিতা কোন ক্ষতির আশঙ্কার সময়ে ত্যাগ করা হয়, তা প্রকৃত নৈতিকতার অন্তর্ভূক্ত বলে কখনও গণ্য হতে পারে না। সত্যবাদিতা প্রমানের এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও কঠিন সময় ও ক্ষেত্র যখন নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ বা সম্মান বিপন্ন হয়। এ সম্পর্কে খোদার শিক্ষা হল:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ

অর্থাৎ "প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাবাদীতা হতে বিরত হও। (সূরা আল হাজ্জ, ২২:৩১)"

মিথ্যাও এক প্রতিমা। এর প্রতি ভরসাকারী খোদার উপর নির্ভর করা ছেড়ে দেয়; সুতরাং মিথ্যা বলায় তাকে খোদাকে হারাতে হয়। আল্লাহ তা'লা আরো বলেছেন :

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ

(সূরা বাকারা, ২:২৮৩-২৮৪)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

(আল আন আম, ৬:১৫৩)।

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

(সূরা নিসা, ৪:১৩৬)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

(সূলা আল মায়েদা, ৫:৯)

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ

(সূরা আল আহযাব, ৩৩:৩৬)

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

(সূরা আসর, ১০৩:৪)

لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

(সূরা ফুরকান, ২৫:৭৩)।

অর্থাৎ "তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহুত হলে, যেতে অস্বীকার করবে না (২:২৮৩) এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সত্য গোপন করে তার হৃদয় পাপী (২:২৮৪)। যখন বল, তখন সে কথাই বলবে যা সত্য কথা এবং ন্যায়বিচারের কথা (৬:১৫৩)।

কোন নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করতে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার জন্য হওয়া উচিত। মিথ্যা না, যদিও সত্য বলায় তোমাদের ক্ষতি হয়, কিংবা অন্য নিকটতম ব্যক্তি, পুত্র পরিজন ক্ষতিগ্রস্থ হয় (৪:১৩৬)। কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাগ্রস্ত না করে (৫:৯)। সত্যপরায়ণ পুরুষ এবং সত্যপরায়ণা স্ত্রী মহাপুরস্কার লাভ করবে। (৩৩:৩৬) তাদের আচার-আচরন অন্যজনের সত্যপরায়ণতার উপদেশ যোগায় (১০৩:৪), এবং মিথ্যা বলা আসরেও তারা বসে না" (২৫:৭৩)। [ইসলামী উসুল কী ফিলোসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০-৩৬১]

ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো

এরপর দ্বিতীয় এই শর্তে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার শর্তও রয়েছে। আর এ বিষয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

অর্থাৎ- ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না, নিশ্চয়ই এটা নির্লজ্জতা এবং অত্যন্ত জঘন্য পথ। (বনী ইসরাঈল, ১৭:৩৩)

একটি হাদীস রয়েছে:

মুহাম্মদ বিন সি'রীন (রা.) বর্ণনা করেন– আঁ হযরত (সা.) নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দান করেছেন, অতঃপর এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন যার মধ্য থেকে একটি উপদেশ হলো এই যে, পবিত্রতা বজায় রাখা অর্থাৎ সতীত্ব রক্ষা করা ও সত্য ধারণ করা, ব্যভিচার করা আর মিথ্যা বলার তুলনায় সর্বদাই উত্তম। (সুনানে দার কুতনি, কিতা'বুল ওসা'আ, বাব মা ওসতা'হিব্বু বিল ওসীয়্যাতে মিনাত্ তাশাহ্হুদে ওয়াল কালামে)

ব্যভিচার ও মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যা থেকে এটা বোধগম্য যে, মিথ্যা কত বড় এক পাপ!

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

"ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাবে না"। অর্থাৎ এমন আচার অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবে, যা মনে এসবের উদ্রেক ঘটাতে পারে। এসব পথ ধরবে না যেখানে এ পাপ ঘটার আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে, সে পাপকে শেষ সীমায় পৌঁছায়। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ, অর্থাৎ (এটা) গন্তব্য পথ রুদ্ধ করে এবং আমাদের গন্তব্যের প্রান্ত সীমার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে বিয়ে করতে পারে না, তার কর্তব্য সে তার পবিত্রতাকে অন্য উপায়ে রক্ষা করবে। যেমন রোযা রাখবে, স্বল্পাহার করবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবে (২৪:৩৪)। [ইসলামী উসুল কী ফিলোসফী, রুহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড, পৃ:৩৪২]

তিনি (আ.) বলেন, এমন আচার-অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাক, যা থেকে মনে (এসবের) উদ্রেক হতে পারে। যুবকরা সচরাচর এটা বুঝে উঠতে পারে না তাদের মাঝে সিনেমা দেখার অভ্যাস জন্মায় আর এমন সব ছায়াছবি দেখে যা দেখারই যোগ্য নয় বরং উন্নত চারিত্রিক মান থেকে অতি নিম্ন স্তরের। এসব থেকেও দূরে থাকতে হবে। এটা ব্যভিচারেরই এক প্রকারবিশেষ।

(চলবে)

ভাষান্তর: মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৪৮)

যীশুর পুনরাগমনকালের বিশেষ ঘটনাবলী ঃ

বশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের চিহ্নাবলী

মথি ২৪ঃ৬-৭"আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; দেখিও ব্যাকুল হইও না; কেননা এ সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে। কিন্তু এসকলই যাতনার আরম্ভ মাত্র" (The end is not yet).

শেষ-যুগ বলতে যীশুর প্রত্যাবর্তন যুগের কথা বলা হয়েছে যার অন্যতম চিহ্ন স্বরুপ যখন চতুর্দিকে অনেক যুদ্ধ এবং যুদ্ধের জনরব প্রধান সংবাদ হিসেবে পরিগণিত হবে। আমরা উনবিংশ শতাব্দী থেকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের দাবানল ক্রমোবৃদ্ধির কথা সবাই অবগত আছি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি যুদ্ধের তালিকা এই সময়-কালকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে ঃ

-১৮১৫ সনে বৃটেন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ।
-১৮১৮ সনে আমেরিকার বিরুদ্ধে বৃটেনের লড়াই।
-১৮৬১-১৮৬৫ সনে আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ।
-১৮৬০ সনে বৃটেন ও চীনের যুদ্ধ।
-১৮৫৭ সনে ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ।
-১৮৭০ সনে তুরষ্ক ও রাশীয়ার যুদ্ধ।
-১৮৯৪ সনে চীন ও কোরিয়ার যুদ্ধ।
-১৯০০ সনে চীনে বক্সার বিদ্রোহ।
-১৮৯৯ সনে বোয়ার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গ্রেট–বৃটেনের যুদ্ধ।
-১৮৯৮ সনে আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ।

-পরবর্তীতে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৫-১৯৩৯) কথা মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠা গুলোকে কলঙ্কিত করেছে।

–সাম্প্রতিক কালের তথা একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী বিরাজমান প্রলয়ংকরী যুদ্ধাবস্থা এবং তৃতীয় বিশ্ব–যুদ্ধের পদধ্বণী মহা সর্বনাশী পরিনামের ইঙ্গিত বহন করছে। বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের ধ্বংসাত্নক যুদ্ধ–মহাযুদ্ধের দৃষ্টান্ত বিশেষত পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের সম্ভাবনা ইতিপূর্বে কখনই ঘটে নাই। প্রধানত এই সকল মহা বিধ্বংসী সামরিক এবং রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে শেষ যুগের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে 'ইয়াজুজ–মাজুজের ফেতনা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে)।

প্রতিশ্রুত সময়-কালের চিহ্ন-স্বরুপ এই ঘটনা গুলোকে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে বাইবেলে এবং অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। সত্যিকার অর্থে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ–মাজুজের বিশৃঙ্খলা এবং ফেতনা থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের জন্য শেষযুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ অবশ্যই আবির্ভূত হয়েছে।

(গ) শেষকালে জ্ঞান–বিজ্ঞানের বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

দানিয়েল ১২ঃ ৪,৮–৯ "কিন্তু হে দানিয়েল, তুমি শেষকাল পর্যন্ত এই বাক্য সকল রুদ্ধ করিয়া রাখ, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখ; অনেকে ইতস্ততঃ ধাবমান হইবে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে। আমি এই কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না; তখন আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু, এই সকলের শেষফল কি হইবে? তিনি কহিলেন, হে দানিয়েল, তুমি প্রস্থান কর, কেননা শেষকাল পর্যন্ত এই বাক্য সকল রুদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে।"

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং মানব জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং শিল্প-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ১৮০০ থেকে ২০০০ সনের আবিষ্কার সমুহ মানব সভ্যতাকে এমনভাবে আলোকিত এবং আলোড়িত করেছে যা ইতিপূর্বে কখনই ঘটে নাই। রোমান সভ্যতার আকাশচুম্বি আবিষ্কার সমুহ এবং তার ফল শ্রুতিতে আর্থ-সামাজিক উৎকর্ষতার মুলে যে সকল যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবদান সর্ব-সম্মতিক্রমে স্বীকৃত সেগুলো প্রধানত উপরোক্ত সময়কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে ভাববার বিষয় হলো বিশ্ব-সৃষ্টির এই সময়-সন্ধিক্ষনে এই সকল যুগান্তকারী আবিষ্কারের পশ্চাতে ঐশী পরিকল্পনার গুপ্ত রহস্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করত ঃ আমরা দাবি করতে পারি যে, শেষ যুগে সত্যের বিশ্বব্যাপি প্রচার-প্রচারনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যতিত বাস্তব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যতবাণী সমুহ পুর্ণতা লাভ করতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরুপ কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলো আলোচ্য বিষয় গুলোর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্ক-যুক্ত।
-বিদ্যুতের বাতির আবিষ্কার (টমাস অ্যালভা এডিসন,১৮৭৮ খৃঃ)
-রেল ইঞ্জিন (জর্জ ষ্টিভেনসন, ১৮২৫)
-টেলিগ্রাফ (এফ,বি, মোর্স, ১৮০৩)
-বাইসাইকেল (কে,ম্যাকমিলণ্, ১৮৪০)
-রেফ্রিজারেটর (জেমস হ্যারিসন, ১৮৫০)
-ডিনামাইট (আলফ্রেড নোবেল, ১৮৬২ নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন)
-পেট্রোল ইঞ্জিন (নিকোলাস অটো, ১৮৭৬)
-টেলিফোন (আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল, ১৮৭৬)
-ফটোফিল্ম ও ক্যামেরা (জর্জ ইষ্টম্যান, ১৮৮৪-১৮৮৫)
-টেপ রেকোর্ডার (ডল মেয়র, ১৮৯৩)
-চলচ্চিত্র যন্ত্র (টমাস, অ্যালভা এডিসন, ১৮৯৩)
-রেডিও (জি-মার্কনী, ১৮৯৪)
-ডিজেল ইঞ্জিন (রুডলফ ডিজেল, ১৮৯৫)
-এক্সরে (ডব্লিউ,কে,রুন্টজে, ১৮৯৫)
-ইলেক্ট্রন (স্যার জোসফ জন থমসন, ১৮৯৭)

-এরোপ্লেন (অরভিল এবং উইলভার রাইট,১৯০৩)
-রাডার (এ.এইচ. টেলর, এবং লিও সি ইয়ং, ১৯২২)
-টেলিভিশন (জন লগি বেয়ার্ড, ১৯২৫)
-জেট ইঞ্জিন (স্যার ফ্রাঙ্ক হুইটল, ১৯৩৭)
-জীবানু তত্ত্ব (লুইস পাস্তর, ১৮২২-১৮৯৫)
-প্রিন্টিং প্রেস, বাস্প-চালিত (কেণীগ এবং এড্রবানের, ১৮১৩)
-টাইপ রাইটার (ক্রিষ্টোকার শোলস্, ১৮৬৭)
-মোটর গাড়ি (কার্ল বেনজ, ১৮৮৫)
–থিওরি অব রিলেটিভিটি (আইনস্টাইন, ১৮৭৯-১৯৫৫)
-রেল রোড স্থাপনা, ইংল্যান্ড (১৮২৫)
-ফোর্ড মোটরস (হেনরী কোর্ড, ১৮৬৩-১৯৪৭)
-হোমিওপ্যাথী (হ্যানিম্যান, ১৭৫৫-১৮৪৩)

এই সকল বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর সময়-কালের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হলো এই যে ঃ উনিশ-বিশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কেন এত অভূতপুর্ব উন্নতি এবং অগ্রগতি? মানব-সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে অদ্যাবধি এই বিষয়ে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ফলতঃ জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির উন্নতি–অগ্রগতির অভূতপূর্ব পর্যায়টি খুবই সুস্পষ্ট। তাই ভেবে দেখতে হবে যে এই সময়–কাল বা Timing–এর বাহ্যিক কার্য–কারন সম্পর্ক ছাড়াও সভ্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে যে ঐশী উদ্দেশ্য এবং সুমহান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা জড়িত তার প্রকৃত স্বরূপ কী? এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ "বস্তুত বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণপ্রচারের যুগ। এর একটি লক্ষন এই যে,প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পুর্ণতর হয়েছে। ছাপা-খানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যাবস্থা, রেলগাড়ি, জাহাজ এবং সংবাদ-পত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মতো করে দিয়েছে। এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুত পক্ষে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছে"। (তবলীগে হক, প্রকাশকাল-১৯০৩ ইং)

(ঘ) বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা এবং বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের অপব্যবহার এবং ঐশী সতর্কবাণীঃ বর্তমান যুগের তথা বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর মহা–বিস্ময়কর অন্যান্য আবিষ্কারগুলো মুলত উপরোক্ত আবিষ্কার গুলোর উপর নির্ভর করেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রযূক্তি, স্যাটেলাইট প্রযূক্তি, মহাকাশযান, খাদ্য, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যানবাহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আবিষ্কার সমুহ, পরমানু শক্তির ব্যবহার (এবং অপব্যবহার),আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি লাভ করেই চলেছে। এখন চিন্তা-চেতনার বিষয় হলো এই যে, উনিশ ও বিশ শতক বিশেষভাবে এবং তার পর হতে অদ্যাবধি মানব-ইতিহাসে এই সকল আবিষ্কার এবং এই সকল আবিষ্কারের পশ্চাতে শুধু জাগতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি-অগ্রগতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে নাই– সেই সঙ্গে এগুলোর আরো একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে যার প্রতি সকল জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞ–জনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। এই যুগ–সন্ধিক্ষনে ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপি মানব সমাজ ও মানব সভ্যতাকে এক মঞ্চে এক মন্ডলী ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই সকল আবিষ্কারগুলোর মানব কল্যান এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা সম্ভবপর হতে পারে- বাস্তবতার নিরিখে। বাস্তবতার নিরিখে কথাগুলোর প্রতি আবারো দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কারণে যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলোর সদ্ব্যব্যবহার দ্বারাই এগুলো আশির্বাদ মূলক হবে। অন্যথায় এগুলোর অসদ্ব্যব্যবহার দ্বারা বিশ্বব্যাপি অভিশাপ এবং মহা–ধ্বংস মানবজাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এই আলোচনার প্রথমাংশে যুদ্ধ–মহাযুদ্ধের উল্লেখ করেছি। পবিত্র কুরআনেও মহা সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ "আমি সতর্ককারী প্রেরণ না করে আযাব প্রেরণ করি না" (আল কুরআন ১৭ঃ১৫)

আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) ঐশী নির্দেশে ঘোষনা করেছেনঃ "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন-কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নাই। অথচ আল্লাহ তাকে গ্রহণ করবেন এবং তার সত্যতা প্রচন্ড আক্রমন দ্বারা প্রকাশ করবেন"। (পুস্তকঃ ঐশী–বিকাশ)।

 দানীয়েল পুস্তকের ১২ঃ৪–৯ উদ্ধৃতিতে বিশ্বব্যাপী জন-মানুষের অস্থিরতা এবং ছোটা-ছুটি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা উনিশ শতকের ইতিহাসের পাঠকগনের কাছে অবিদিত নয়। ইতিপূর্বে আমরা পৃথিবী–ব্যাপী উপনীবেশবাদের মহা– বিস্তৃতির কথা উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে আরো কতকগুলো মারাত্মক অস্থিরতামুলক দৃষ্টান্ত নিম্নরুপঃ

-১৮৪২এবং ১৮৪৩ সনে দক্ষিন ও পূর্ব ইংল্যান্ডে কৃষি শ্রমিকদের যন্ত্র বিরোধী দাঙ্গা–হামলা।

-সাইমন বলিভার নামক শ্রমিক নেতার নেতৃত্বে ১৮০০ সনের প্রথমাংশে দক্ষিন আমেরিকার ভ্যানিয়ুয়েলা,আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে এবং মেক্সিকো অঞ্চলে তৎকালীন স্পেনিশ এবং পর্তুগিজ উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের ঘটনাবলী।

-১৮৩০ সনে ফ্রান্সের শাসকদের বিরুদ্ধে সে দেশের ছাত্র-সমাজ এবং শ্রমিকদের দুর্বার আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপি নৈরাজ্যকর

পরিস্থিতিতে দশম চার্লসের স্বদেশ থেকে পলায়নের ঘটনা।

-পূর্ব ইউরোপের স্লাভদের বহু দলে বিভাজন–মুলক সমস্যাবলী এবং প্রাগের বিপ্লব যা অষ্ট্রিয়া কঠোরভাবে দমন করেছে।

-১৮৮১ সনে রাশিয়ার জারের শাসনামলে নিহি–ইলিজম (Nihilism-সব কিছুতেই অবিশ্বাসমুলক) মতবাদের অনুসারিরা সর্বাত্মক ধ্বংসকারী বিদ্রোহ পরিচালনা করে এবং তারা জার আলেকজান্ডারকে হত্যা করে। এই ঘটনা মুলতঃ রাশিয়া সহ ইউরোপের সকল রাজ–সিংহাসনের অধিকারীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে ১৯ শতকের শেষাংশের ঘটনা প্রবাহ আক্রমনাত্মক রুপ পরিগ্রহ করে যা ইতিপূর্বে কখনই এত তীব্রভাবে অনুভূত হয় নাই।

–বৃটেন ১৮৮৭ সনে ট্রাফলগার স্কয়ার থেকে আন্দোলন কারীদেরকে বিতাড়নের জন্য বিশেষ বাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করে।

–১৮৯০ সনে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনকারীগণ ইউরোপ ও আমেরিকায় দৈনিক আট–ঘন্টা কাজের জন্য দাবীনামা পেশ করে। ১৮৯৪ সনে দাবীকারীদের দমনের জন্য আমেরিকার ইলিনয় শহরে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়।

-চীনে ১৮৯৮ সনে সে দেশের তৎকালীন রাণীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং সেই সঙ্গে দেশব্যাপী বিদ্রোহ, খুনা–খুনী এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের কারনে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

-উনিশ শতকের অস্থিরতা–পূর্ণ এবং বিশৃঙ্খল বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রনিধান–যোগ্যঃ

R.A.Wallace in his book, "**The Wonderful Century**", 1898, summarized the mood of the time:

"There was, therefore,no 19th century resting place.The French Revolution, combined with the Industrial Revolution (both unfinished), affected both ways of thinking and feeling. The repercossions are still echoed today."

(চলবে)

ইসলামী শিক্ষা

ভোটের আমানত যথোপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা

মাহমুদ আহমদ সুমন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিধি-বিধান অনুযায়ী সকল জামাতে দেশীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে আমীর/প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ তা'লা ভোটকে আমাদের ওপর বিশেষ এক আমানত স্বরূপ ন্যস্ত করেছেন। আমরা যদি আমাদের ওপর অর্পিত এই আমানতকে সঠিকভাবে মর্যাদা না দেই এবং যথাস্থানে প্রয়োগ না করি তাহলে মহান আল্লাহ পাকের কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তাই এ পবিত্র আমানতের হেফাজত করা প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমানতসমূহ এর যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্র উপদেশ কতই চমৎকার" (সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯)। শাসন ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে এই আয়াতে জনগণের আমানত বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান হবেন যেমন নির্বাচিত তেমনি জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্টও হবেন জামাতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি আর সেই পদে নির্বাচনের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে ভোট দানের নির্দেশ ইসলামে দেয়া হয়েছে। তবে ইসলাম পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্খা করতে নিষেধ করেছে।

যেভাবে মহানবী (সা.) হযরত আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.)-কে বলেছিলেন, 'হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! 'নেতৃত্ব'-এর প্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রাপ্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব লাভ করলে তোমার ওপরই যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। তুমি কোনো কার্যক্রম ঠিক করার পর এর বিপরীত কার্যক্রমে কল্যাণ লক্ষ্য করলে তখন যেটা ভালো সেটাই করবে এবং পূর্ব-সিদ্ধান্তের কাফফারা আদায় করবে' (বুখারী ও মুসলিম)। ওপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানগণকে এবং শাসনকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে, তারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করেন।

দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য যেমন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা খুব প্রয়োজন তেমনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্যও প্রয়োজন সৎ ও মুত্তাকী ব্যক্তির। ভোট যেহেতু আমানত এর জন্য ভোটারদের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম তার পক্ষে ভোট দেয়ার শিক্ষাই ইসলাম প্রদান করে। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যেমন অধিক পুণ্যের কাজ, তেমনি অসৎ, অনুপযুক্ত, দুষ্কৃতকারী কোন ব্যক্তিকে ভোট দেয়াও শক্ত গুনাহের কাজ। পবিত্র কুরআনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে যেমন হারাম জ্ঞান করা হয়েছে, তেমনি সত্য সাক্ষ্য দেয়া মু'মিনের জন্য ওয়াজিব করেছে। ভোট একটা সত্য সাক্ষ্য। আর এ সত্য সাক্ষ্যকে গোপন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। মু'মিনদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশী সৎ, মুত্তাকী কেবল মাত্র তারাই এই নেতৃত্বের আমানতের বোঝা বহন করার অধিকতর যোগ্য, তাদের হাতেই এ আমানত অর্পণ করার শিক্ষা ইসলাম আমাদেরকে দেয়। আমাদেরকে দেখতে হবে যাকে আমরা ভোট দিতে যাচ্ছি তিনি এর যোগ্য কি'না বা এই আমানতের ভার বহন করার মত শক্তি তার মাঝে আছে কি না। এমন যেন না হয়, এ ব্যক্তিকে আমি পছন্দ করি বা অমুক আমার প্রিয়জন, তিনি আমার ভাই বা আত্মীয়, তাই তাকে ভোট দিচ্ছি। এই ধরণের চিন্তাভাবনা যেন মোটেও আমাদের মনে উদয় না হয়, আমরা যদি আমানতের সঠিক ব্যবহার না করি তাহলে খোদা তা'লার কাছে জিজ্ঞাসিত হব। এছাড়া অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করার ফলে তার মাধ্যমে যদি কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হয় তার জন্য আমাদেরকেও খোদার কাছে জবাব দিতে হবে। তাই যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা খলীফার প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন তাদের অনেক বেশি দোয়া করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা শুধু শাসকদেরকেই জবাবদিহি করবেন না যে, তুমি সঠিক কাজ কর নি কেন? বরং ভোটারদেরকেও এই বলে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমাকে

হুযূর (আই.) বলেন, আমাদের এমন কোন কর্মকর্তার প্রয়োজন নেই যারা তাদের নামায সঠিক ভাবে আদায় করে না। কারণ, জামা'তের কর্মকর্তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়মিত হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় বন্ধন ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সেই কর্মকর্তাদের প্রয়োজন যারা জামা'তের কাজকে এগিয়ে নিতে ইবাদতকে আন্তরিকতাপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

যে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছিল তুমি তার সঠিক প্রয়োগ কেন কর নি?

অনুরূপভাবে যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হোন তাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তারা (শাসক) জনগণের সাথে কাজকর্মে নম্রতা অবলম্বন করবে, তাদেরকে ভালোবাসবে, তাদেরকে সদুপদেশ দিবে এবং তাদেরকে প্রতারিত করবে না, কঠোরতা করবে না, তাদের কল্যাণ সাধনে ও প্রয়োজন পূরণে অমনোযোগী হবে না। তারা যদি জনগণের সুখে দুঃখে, বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে তারা যেমন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা হবে সফল। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ ও সীমালংঘন। আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো'। (সূরা নাহল, আয়াত: ৯২)

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন হযরত আবু ইয়ালা মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে প্রজাসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের সাথে প্রতারণা করে থাকে, তবে সে যেদিনই মরুক, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলপাক (সা.) জনপ্রতিনিধিদের সতর্ক করে আরো বলেছেন, 'তোমরা সাবধান হও! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' (বুখারি)। আবার যারা ন্যায়ের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তাদের জন্য শুভ সংবাদও রয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে, যারা তাদের বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত করা হয় সে সব বিষয়ে সুবিচার করে' (মুসলিম)।

এছাড়া শাসকের আনুগত্যের বিষয়েও ইসলামে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। শাসকের পাপমুক্ত সকল ন্যায়ানুগ নির্দেশের আনুগত্য করার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন। আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের' (সূরা নিসা, আয়াত: ৬০)। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর শাসকের নির্দেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য, চাই তা তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাপাচারের আদেশ দেয়া হয়। পাপাচারের আদেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার কোনো অবকাশ নেই' (বুখারী ও মুসলিম)।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরা ২০১৩-এ কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। এখানে হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনার কিছু অংশ তুলে ধরছি। তিনি তাঁর বক্তৃতার একাংশে বলেন, সকল কর্মকর্তাগণ অবশ্যই আস্থা ও বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্তাবলী পূরণ করবেন যেমন তাদের কাছে প্রত্যাশা করা হয়েছে। আস্থা পূরণের উপায় হলো, যেকোন কাজ যা আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সততা ও চারিত্রিক শুদ্ধতার সঙ্গে আন্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে আপনার সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সামর্থ্য দিয়ে সম্পন্ন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

একজন কর্মকর্তাকে অবশ্যই তার সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য সময় কুরবানী দেয়া এবং গভীর মনোনিবেশ প্রদানে ইচ্ছুক হতে হবে। মনে রাখবেন, সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র মহানবী (সা.) এর জন্য নয় বরং সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিশেষ করে যাদের প্রতি আস্থা আনা হয়েছে এবং দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আমরা, আহমদীগণ সেই মানুষ যারা মহানবী (সা.) এর প্রকৃত শিক্ষা ও অনুপম আদর্শকে অনুসরণ করছি বলে দাবি করি এবং তদ্রুপ আকাঙ্খাই পোষণ করি। আমরা হলাম সেই মানুষ, যারা জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে সেই ভাবে দেখতে চাই ঠিক যেভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তাই, আমি যেমনটা

বলছিলাম, সকল কর্মকর্তাগণ যাদেরকে দায়িত্বাবলী দেয়া হয়েছে, তারা দয়া, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার সাথে তা পালন করবে। তারা অবশ্যই এটা নিশ্চিত করবে যে, তাদের হৃদয় থাকবে কোমলতা এবং জামা'তের সদস্যদের জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ। তারা অবশ্যই তাদের অধস্তন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সাথে মহব্বতপূর্ণ বিনম্র ভদ্র আচরণ করবে। তাদের হৃদয় অন্যান্যদের দূরে ঠেলে দেয়ার পরিবর্তে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে।

যদি তাদের হৃদয় কোমল না হয় বরং তারা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হয় এবং তারা উচ্চ নৈতিক আচরণ প্রদর্শন না করে তাহলে তা আহমদীগণের মধ্যে গভীর অস্থিরতা বয়ে আনবে। এতে মানুষ শুধু বিচলিতই হবে না, বরং এমন কর্মকর্তার আচরণের জন্য হতাশ হবে এবং বাস্তবে তারা নিজেদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে সরিয়ে নিবে। প্রকৃতপক্ষে, এটাও সম্ভব যে, তারা জামা'তের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবে অথবা তাদের মধ্যে যুগ-খলীফা সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাবে। তাই এটা বেশ স্পষ্ট যে, সহমর্মিতার সাথে আমল করতে ব্যর্থ হলে তার পরিণাম হবে সুদূর প্রসারী এবং ভয়াবহ।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, মনে রাখবেন, আমাদের এমন কোন কর্মকর্তার প্রয়োজন নেই যারা তাদের নামায সঠিক ভাবে আদায় করে না। কারণ, জামা'তের কর্মকর্তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়মিত হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় বন্ধন ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সেই কর্মকর্তাদের প্রয়োজন যারা জামা'তের কাজকে এগিয়ে নিতে ইবাদতকে আন্তরিকতাপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, যদি তাঁর সাহায্য কোন ব্যক্তির সাথে থাকে তবে সাফল্য ও বিজয় অর্জন থেকে তাকে কোন কিছুই আটকাতে পারে না। একজন সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার রয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। সে ব্যক্তিই সত্যিকারের ঈমানের অধিকারী হতে পারে, যে তাঁর (আল্লাহ্‌র) সমীপে বিনয়াবনত হয়, ফরজ (অবশ্যকরণীয়) ও নফল (ঐচ্ছিক) উভয় নামাযই নিয়মিত আদায় করে।

হুযূর (আই.) তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকে আরো বলেন, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আমাদের ঈমান ও আমলে অর্থাৎ কথা ও কাজ মিল ও সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ আমাদের উচিত আমরা যা বিশ্বাস করি তার ওপর আমল করা এবং এ সম্পর্কে আমি বিভিন্ন সময় বলেছি। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র যখন আমাদের বিশ্বাস এবং আমল এক হবে তখনই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারবো। শুধুমাত্র যখন আমাদের আমল আমাদের বিশ্বাসের আয়না হবে, তখন আমরা সেই পথ দিয়ে হাটবো, যে পথ আমাদেরকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে এবং এটা আমাদের সন্তান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রক্ষাকবচ হিসেবেও প্রমাণিত হবে। আপনারা সর্বদা দোয়া জারি রাখবেন আপনাদের নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কারণ দোয়া ছাড়া আপনি কখনও সাফল্য লাভ করতে পরবেন না কিংবা আপনার প্রজন্মকে সংশোধন করতে পারবেন না। আল্লাহ্ আপনাদের সবাইকে আমি যা বলেছি তা বুঝার এবং তার ওপর আমল করার সক্ষমতা দান করুন, আমীন।

আমাদের সকলকে হুযূর (আই.)-এর নসীহতের ওপর আমল করার শক্তি দান করুন। এছাড়া আমাদের সকলের উচিত হবে, এমন ব্যক্তির ওপরই আমানত হস্তান্তর করা যিনি তা বহন করার শক্তি রাখেন। তাই আমাদেরকে ঈমানের সাথে যোগ্য ব্যক্তির কাছে এই আমানতকে হস্তান্তর করতে হবে যাতে করে আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ পালনকারী হতে পারি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর আমানতকে যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"বিশ্বের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রকৃত মুসলমানের করণীয়।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ মে, ২০১৬-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com
masumon83@yahoo.com

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১১তম কিস্তি)

১৯৬৪–১৯৬৫

১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের ৪৭তম সালানা জলসায় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে দুইজন শহীদ হওয়ার পর ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়নি। অতঃপর ৫-৭ মার্চ ১৯৬৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৫তম সালানা জলসা। এ জলসায় রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, মওলানা শেখ মোবারক আহমদ এবং এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক। ৫ মার্চ উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষন দান করেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার গুণগান ও তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য আমাদের এই জলসা। যে মহামানব খাতামান নবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে রহমানুর রহিম আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় ও মানবতার জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দিয়েছেন–যাঁর অনুসরণে বিশ্বের শান্তি নিহিত তাঁর আনিত দ্বীন ইসলামের আলোতে বর্তমান দুনিয়ার সমস্যাদী সম্পর্কে আমাদের বক্তারা এ জলসায় বক্তৃতা দিবেন।

বর্তমান যুগ জলসা মাহফিলের যুগ। কিন্তু একান্তভাবে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জলসা ও মাহফিলের আয়োজন আজকের জগতে তুলনামূলক ভাবে খুবই কম। একনিষ্ট ভাবে দ্বীনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মহব্বতে ও মানবের ভ্রাতৃত্বকে মজবুত করার জন্য আমরা আহমদীরা সমবেত হই এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সাদরে আহ্বান জানাই। এই যুগে এই ধারার জলসার পত্তন হয়েছিল আজ থেকে ৬৮ বছর পূর্বে।

ধর্মের প্রকৃত রূহ থেকে দূরে সরে যাবার ফলে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মের শাখার আলেম, উলেমা, পীর, পুরোহিত, পাদ্রী ও পন্ডিত যখন দ্বন্দ্ব কলহকে ধর্মের লক্ষ্য মনে করেছিল এবং ধর্মীয় সভা যখন আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণের জন্য ডাকা হত তখন আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্যকে লাভ করার জন্য শান্তি, প্রীতি ও পবিত্রার মধ্য দিয়ে জলসার প্রবর্তন করেন। মানবজাতি আজ বর্দ্ধায়মান সমস্যার বেড়াজালে বেধে দিশাহারা। জীবনের সব দিকে তার অশান্তির আগুন। মানব জাতির এহেন দুর্দিনে তার উদ্ধার চিন্তা ও সে বিষয়ের প্রচেষ্টা প্রত্যেক মানবদরদীর কর্তব্য। ইসলামের সুশীতল চন্দ্রাতপকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করে তার তলে সকল মানবকে আনার মধ্যে জগতের উদ্ধার রয়েছে। জীবন্ত ও শান্তিদায়ক ইসলাম আজ জগতবাসীর বড় প্রয়োজন। ইসলামের বাণী ও আদর্শ আজ জগতের কোণে কোণে পৌছান একান্ত প্রয়োজন। আহমদীয়া জামাত এ কাজের আত্মনিয়োগ করেছে। আমাদের কর্মী ও উলেমা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সকল প্রকার কুরবানী করে পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল নদী নালা, সাগর-সমুদ্র ও প্রান্তর মরুভূমি পার হয়ে বিপদ ছায়াঘন সারা দুনিয়ার শহর গ্রাম ও লোকালয়ে ইসলামের উজ্জ্বল বাতি ও অভয় বাণী নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শান্তিকামী মানব একে একে সে ডাকে সাড়া দিয়ে চলেছে। এ কাজে সব মুসলমানের তাদের সহযোগী হওয়া দরকার। এই পথেই বিশ্বের শান্তি আসবে। (পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ মার্চ ১৯৬৫)।

জলসা সমাপ্তির পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়-পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ৪নং বকশীবাজার রোডস্থ, দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে ৫, ৬ ও ৭ মার্চ তারিখে ৪৫তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু আহমদী যোগদান করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান হতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলিম মিশনারী মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, পূর্ব আফ্রিকার প্রাক্তন মুসলিম মিশনারী মওলানা শেখ মোবারক আহমদ এবং নিগরান বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মির্যা আব্দুল হক এডভোকেট, উক্ত জলসায় আগমন করেন এবং বক্তৃতা দান করেন। (পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ মার্চ ১৯৬৫)।

১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি ৪নং বকশীবাজার, দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয় ৪৬তম সালানা জলসা। প্রথমে জলসা ৪, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি-১৯৬৬ তারিখ অনুষ্ঠানের ঘোষণা থাকলেও পরে তারিখ পরিবর্তন করা হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে আহমদী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, এই জলসায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের

বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমান দুনিয়ার সমস্যাদী সম্পর্কে, [যেমন কুরআনের ফজিলত, হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী, জড়বাদিতা ও ইসলাম, ইসলাম ও বিশ্বশান্তি, জেহাদের ফজিলত ইত্যাদি বিষয়ে] আলোচনা করবেন ও সমাধান পেশ করবেন। দলমত নির্বিশেষে সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, যেন তাঁরা এই জলসায় যোগদান করে অশেষ পুণ্য ও আশিস লাভ করেন। জলসা শেষে ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টায় মজলিসে মোশাওওবাত [পরামর্শ সভা] বসবে।

মুহাম্মদ সামসুর রহমান
এল-এল বি [লন্ডন], ব্যারিষ্টার এট-ল
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি
(পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ জানুয়ারী ১৯৬৬)।

এ মহতী জলসার প্রাক্কালে বাঙালি আহমদীদের হৃদয়ের পরশমণি জ্বালানোর মানুষ সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব তাঁর সহধর্মিণী ধর্মপরায়ণা মহিলা আসেফা বেগম সাহেবাসহ ঢাকায় আগমন করেন। তখন তাঁর সাথে আরো সফরসঙ্গী ছিলেন (১) মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, (২) এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক এবং (৩) মওলানা মোহাম্মদ সাদেক। তখন ঢাকার দারুত তবলীগে পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়। মোহতরম মির্যা আব্দুল হক সাহেবের মাধ্যমে ইজতেমায়ী দোয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কর্তৃক কাদিয়ান থেকে আনিত এবং দোয়া করে প্রেরিত একটি ইটের দ্বারা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব। অতঃপর ইট স্থাপন করেন মোহতরম মির্যা আব্দুল হক, মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী ও মওলানা মোহাম্মদ সাদেক, এ দেশীয় বুযূর্গ মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, আনোয়ার আহমদ কাহলুন সাহেব এবং ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ শামসুর রহমান সাহেব। মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর প্রাদেশিক জলসার অধিবেশন শুরু হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশনে আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, গত বছরের সালানা জলসার পর ১১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমরা আজ আবার এখানে মিলিত হয়েছি। এই ১১ মাসের মধ্যে আমরা বড় আকারের বহু বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'লার বড় বড় অনুগ্রহের নিদর্শন দেখেছি। হযরত রসূল করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, একটি কণ্ঠহার ছিঁড়ে গেলে তাঁর দানাগুলি যেমন একটির পর একটি দ্রুত গতিতে খসে পড়ে, তেমনিভাবে এ যুগে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি বিপদ দেখা দিবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এর তসদীক করেছেন এবং সে সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দিয়েছেন। তদনুযায়ী আমরা নিত্য নূতন বিপদাবলী দ্বারা আজ পৃথিবীকে বিপর্যস্ত দেখি। এসব এই জন্য হচ্ছে যে, মানুষ খোদাকে ছেড়ে মনপ্রাণ দিয়ে পার্থিবতায় নিমগ্ন হয়েছে। এহেন অবস্থা হতে তাদের উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রেরিত পুরুষের মারফৎ প্রেমের ডাক দিয়েছেন।

কিন্তু সে ডাকে মানুষ সাড়া না দেওয়ায়, বিপদের ওপর বিপদের কষাঘাত হেনে তার অধো দৃষ্টিকে তিনি ঊর্ধে ফিরাতে চান। কারণ জড়সুখ মানুষকে সংকীর্ণতা ও মৃত্যুর দিকে টানে এবং তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেম তাকে চির প্রসারতা ও অমর জীবনের পানে নিয়ে যায় ও তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে। মানবের দৃষ্টি নিম্নে নিবদ্ধ হয়ে আজ অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই অপূর্ব পার্থিব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি বিশ্ব সমস্যার সমাধান আনার পরিবর্তে তাকে জটিল ও শঙ্কাজনক করে তুলেছে। মানব তার জ্ঞান দ্বারা বিশাল পৃথিবীকে এক জায়গায় জমা করে ফেলেছে। পৃথিবী আজ একটি ছোট মহল্লায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু নিজেদের বেলা তাদের হৃদয় পরস্পর থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এই বিচ্ছিন্ন হৃদয়গুলিকে এক করে বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য বিশাল ও আয়ত লোচন এবং মহান হৃদয় সম্পন্ন মহামানবের প্রয়োজন। সেই মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর শিক্ষাই আজ সর্বজাতি সমন্বয়ে বিশ্বমানব সমাজ গঠনে সক্ষম। সেই শিক্ষা পালন ও প্রচার এবং প্রসারের কর্তব্যভাবে মুসলমান জাতির ওপর ন্যস্ত ছিল। সে কর্তব্যে তারা অবহেলা করায় আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়ে আহমদীয়া জামাতের স্কন্ধে সে ভার ন্যস্ত করেছেন। (পাক্ষিক আহমদী– ১৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬)।

কর্মসূচি অনুসারে উদ্বোধনী বক্তৃতার পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবসহ আগত সম্মানিত খোদা প্রেমিকরা বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ এবং ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় হৃদয়গ্রাহী অমূল্য ভাষণ দান করেন। ফলে ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার এ জলসা সার্বিকভাবে সার্থক ও সফল হয়। জলসার দ্বিতীয় দিন ১২ ফেব্রুয়ারী বাদ মাগরিব মির্যা আব্দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মজলিসে ইন্তেখাবের (নির্বাচনী সংস্থা) অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব সর্বাধিক ভোট পান। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁকে তিন বছরের জন্য পুনরায় প্রাদেশিক আমীর নিয়োগ করেন। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখ জুমুআর নামাযের পর ঢাকা দারুত তবলীগে পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পূর্বে সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরের প্রাদেশিক আমীর মির্যা আব্দুল হক সাহেবের নেতৃত্বে দোয়া করা হয়। তৎপর কাদিয়ান হতে আনিত একটি ইট মির্যা তাহের আহমদ সাহেব সর্বপ্রথমে স্থাপন করেন। ঐ ইটটি প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের অনুরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) দোয়া করে রাবওয়া হতে মওলানা আবু আতা জলন্ধরী সাহেবের মারফত প্রেরণ করেন।

মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের পরে যথাক্রমে ইট স্থাপন করেন সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরের প্রাদেশিক আমীর মির্যা আব্দুল হক সাহেব, মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব (প্রাদেশিক আমীর), মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব (সম্পাদক, আল ফুরকান), মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (প্রাক্তন আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া), জনাব চৌধুরী আনওয়ার আহমদ কাহলুন (নায়েব আমীর, ই.পি.এ.এ) এবং জনাব সামসুর রহমান, বার-এট, ল।

অতঃপর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৬তম বার্ষিক জলসা অতি সাফল্যের সাথে গত ১১, ১২, ১৩ ফেব্রুয়ারি ৪নং বকশীবাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদেশের দূরাঞ্চল হতে লোকজন জলসায় যোগদান করার জন্য ঢাকা আগমন করেন। সফল জলসা অনুষ্ঠিত হয়। (সংক্ষিপ্ত) (পাক্ষিক আহমদী– ১৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬)।

(চলবে)

আহমদনগর, শালসিড়ি'র ৭তম আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৬ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালসিড়িতে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

গত ৮-৯ এপ্রিল ২০১৬ আহমদনগর-শালসিড়ির ৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসার কার্যক্রম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শালসিড়ি'র মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনের বিশাল খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ আকন্দ। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব রাহুল আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'লার কাছে যে দোয়া করেছিলেন তা উল্লেখ করে বলেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই দোয়ার অংশী করেন। এছাড়া তিনি শৃংখলা, প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।

এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদ নগর।

বক্তৃতা পর্বে 'আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের উপায় ও কবুলিয়্যাতে দোয়া' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে আল্লাহ তা'লাকে লাভ করার পদ্ধতি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহকে লাভ করতে হলে মহানবী বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে। তাঁর অনুসরণ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় রাস্তা অবশিষ্ট নেই। তিনি বলেন, বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই, আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন। আল্লাহকে লাভ করতে হলে মহানবী (সা.) যেভাবে উঠতে বসতে সর্বক্ষেত্রে দোয়া করেছেন ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরকেও দোয়া করতে হবে।

আমরা যদি সব সময় দোয়া করি তাহলে পবিত্র কুরআনের সাত শত আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হবে। এছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সারাংশই হল দোয়া। আর আমরা এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বাবস্থায় দোয়া করার শিক্ষাই পেয়েছি।

এরপর 'মানব প্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতা' বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় স্পষ্ট করেন মহানবী (সা.) মানবের প্রতি কত অসাধারণ প্রেম ছিল। তিনি মানবের কষ্টে এতই ব্যথিত হতেন যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তুমি কি মানবের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবে। তিনি মহানবী (সা.)-এর মানব প্রেমের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি (সা.) ইহুদীর লাশকেও সম্মান করেছেন। শেষে তিনি বলেন, ইসলামের নবীর কত মহান ও উত্তম আদর্শ, অথচ আজ এই মুসলমানকেই বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী। ইসলাম শান্তির ধর্ম আর সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই মহানবী (সা.)-এর আগমন। তিনি শেষে সকলকে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড় সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ার সাদাদ সম্রাট। তিনি বলেন জলসার সুন্দর পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন স্থানের ইসলামী মাহফিলে যোগদান করেছি কিন্তু আহমদীয়া জামাতের জলসার মত এত সুশৃঙ্খল আর কোথাও দেখিনি। আমাকে মুগ্ধ করেছে এখান বিষয়ভিত্তিক আলোচনা।

তিনি আরো বলেন, আমার ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও বক্তৃতাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। মহানবী (সা.)-এর দোয়া এবং মানব প্রেমের বক্তৃতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের

জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন পঞ্চগড় সদর উপজেলার চেয়ারম্যান
জনাব আনোয়ার সাদাদ সম্রাট

জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
বনগ্রাম বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ

উচিত হবে এসব বক্তৃতায় যা বলা হয়েছে তা যেন মেনে চলি। আসলে আমরা যদি এসব কথা মেনে চলি তাহলে কোর্ট-কাচারী, ঝগড়া বিবাদ কিছুই থাকতো না, আমরা পৃথিবীকে বেহেশত বানাতে পারতাম। তাই আসুন আমরা সবাই নবীর তরীকা মোতাবেক নিজেদের জীবনকে সাজাই। শেষে তিনি জলসার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

জলসার এ পর্যায়ে স্বরচিত নযম পাঠ করেন জনাব জি, এম, সিরাজুল ইসলাম। আর এই নযম পাঠের মাধ্যমেই জলসার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এজলসায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ অংশ নেয়। এছাড়া আহমদনগর-শালসিড়ি গ্রামের সকল আহমদী সদস্য এবং বেশ কিছু অ-আহমদী মেহমানগণ যোগদান করেন।

মাগরীব এশা জমা নামাযের পর লন্ডন থেকে এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সকলেই জলসা গাহে বসে শ্রবণ করেন। খুতবার পর প্রশ্নত্তোর সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে বেশ কিছু মেহমান অংশ নেন। মেহমানগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করলে আহমদীয়া জামা'তের মওলানাগণ কুরআন হাদীসের আলোকে উত্তর প্রদান করেন। যথাযথ উত্তর পেয়ে ৬জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হোন।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন ৯ এপ্রিল শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিটে আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ইলিয়াস আলী। নযম দলগত পাঠ করেন জনাব আসিফ আহমদ মন্ডল ও তার দল।

বক্তৃতা পর্বে 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন ও তাকে মান্য করার গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন কুরআন হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এরপর 'তরবিয়তে আওলাদ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। তিনি তার বক্তৃতায় যে বিষয়টি স্পষ্ট করেন তাহলো সন্তান-সন্ততিকে উত্তমভাবে গড়ে তুলতে হলে পিতা-মাতাকে অবশ্যই উত্তম হতে হবে। এছাড়া তিনি আরো বলেন, যুগ খলীফার নির্দেশনা মোতাবেক আমাদেরকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আমাদের সন্তানরা কোথায় যায়, কার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে সব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম, আব্দুল হক।

এরপর 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ-খলীফার প্রচেষ্টা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব খলিলুর রহমান। তিনি তার বক্তৃতায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া খলীফারা যে কাজ করেছেন এবং করছেন তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে যুদ্ধ বন্ধ করে ইসলামের শান্তির ছায়া তলে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় করণীয় কি তা সম্পর্কে তাদের অবগত করছেন।

'খাতামান নাবীঈন-এর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। তিনি তার বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের আলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের সবার উচিত হবে এই মহান রসূলের জীবনাদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করা।

এরপর 'মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতার একে একে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপি মানবসেবার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেন। হিউম্যানিটি ফার্স্টের কথা বলেন যারা কিনা অহরাত্র মানবতার সেবায় নিবেদিত আছে। আফ্রিকার এমনও অনেক মন্ত্রী রয়েছেন যারা কিনা আহমদীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজেই লেখা পড়া করেছেন। স্বেচ্ছায় রক্তদান কেন্দ্র সহ এমনই অভিভূত প্রকল্পের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বহু পূর্ব থেকেই সম্পৃক্ত। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবতাই সবচেয়ে বড়, এটিই ইসলামের শিক্ষা।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায় আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব

জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী আকন্দ। নযম পাঠ করেন জনাব যুবায়ের আহমদ রিয়াদ।

বক্তৃতা পর্বে 'বা-জামাত নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলা। তিনি তার বক্তৃতায় নামায কি? মানব জীবনে বাজামাত নামাযের প্রয়োজনিয়তা কী এবং এর কী কী কল্যাণ রয়েছে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এছাড়া তিরি আরো বলেন, নামায প্রতিষ্ঠার জন্য যুগ যুগ ধরে যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে সবাই এ বিষয়ে তাকিদ দিয়েছেন। আমরা যখন নামাযে দাঁড়াই তখন আল্লাহ্‌র কাছে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। বা-জামাত নামাযের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অধিকার আদায়ের পাশাপাশি বান্দার অধিকার আদায়ের সুযোগ হয়। এ কারণেই নামাযকে ইসলামে সমস্ত ইবাদতের মূল বলা হয়েছে। এছাড়া তিনি নবী করীম (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী থেকেও নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

এরপর 'মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উপস্থাপন করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন-সম্পদ কুরবানীর গুরুত্বটি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমরা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর রাস্তায় খরচ করি তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের ধন-সম্পদে অনেক বৃদ্ধি করবেন। এ পর্যায়ে সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

জলসায় শুভেচ্ছা-বক্তব্য রাখেন বনগ্রাম বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা যে দেশের জন্য কল্যাণকর এবং সমাজের শান্তিকামী ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব রাখেন, এজন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এরপর 'পর্দার গুরত্ব ও খাঁটি আহমদীয়া সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, পর্দা কখনই প্রগতিশীলতার বিরোধী নয়। আমরা দেখি, যত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ফুল রয়েছে তা সব আবৃত থাকে। তিনি বলেন, ইরানের দূতাবাস থেকে একটি নিউজ লেটার প্রকাশিত হয় তাতে তারা খুব সুন্দর সুন্দর কথা লেখে একটি কথার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে যাতে লেখা ছিল 'আমি ফুলের মত সুন্দর কিন্তু পর্দা দিয়ে ঢাকা'। ইসলামে যে পর্দার কথা বলা হয়েছে তা এইজন্যই বলা হয়েছে যে, নারীরা যেন নিরাপদ থাকে অর্থাৎ নিরাপত্তার জন্য। শেষে তিনি বলেন, যে বাড়িতে আদর্শ আহমদী মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসবে সেই বাড়ি কখনও আহমদীয়া আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না। জান্নাতি নারী মা হলে তার কোলে লালিত সন্তানরাই জান্নাতী হয়। এছাড়া তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইস বুকের কুফল সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং আহমদী কোন নারী যেন এতে তার ছবি পোষ্ট না করে সেই আহ্বান জানান।

এরপর ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আলহাজ্জ তাহের আহমদ, সহকারী অফিসার জলসা সালানা।

এরপর সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন জনাব আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় জলসায় অংশগ্রহণকারী সব সদস্যবৃন্দকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত শিক্ষা নিষ্ঠার সাথে পালন করার আহ্বান জানান।

মাগরীব ও এশা নামাযের পর মসজিদে প্রশ্নত্তোর সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে ন্যাশনাল আমীর এবং মুবাল্লেগ ইনচার্জ সহ বেশ কিছু মেহমান অংশ নেন। মেহমানগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করলে আহমদীয়া জামা'তের মওলানাগণ কুরআন হাদীসের আলোকে উত্তর প্রদান করেন। যথাযথ উত্তর পেয়ে ৬জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হোন। জলসায় মোট ১২জন বয়আত গ্রহণ করেন।

জলসায় প্রায় ৩ হাজার সদস্য/সদস্যা অংশ নেয়। যে জামা'তগুলো থেকে অংশগ্রহণ করে- চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, সোনারগাঁও, তেজগাঁও, মিরপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, রগুনাথপুরবাগ, তারুয়া, ঘাটুরা, ভাদুগর, বিষ্ণপুর, বি-বাড়িয়া, রাজশাহী, খুলনা, সুন্দরবন, নাটোর-তেবাড়ীয়া, সৈয়দপুর, শ্যামপুর, মাহিগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, চড়াইখোলা, মেনানগর, দিনাজপুর, ভাতগাঁও, জগদল, বীরগঞ্জ, হেলেঞ্চাকুড়ি, কমলাপুকুরী, আহমদনগর এবং শালসিড়ি।

ডেস্ক রিপোর্ট

ছবি: সুমন মাহমুদ

সংবাদ

ঘাটুরায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ মার্চ ২০১৬, শনিবার বিকাল ২-৩০ মিনিট হতে ৫-৩০ মিনিট পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারি, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম আরমান। নযম উর্দু পরিবেশন করেন জনাব এস, এম হাবিবুল্লাহ্। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ মূসা মিয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা। বক্তৃতা পর্বে ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবনীর ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব এস, এম, ইব্রাহীম। 'মহানবী (সা.) এর বিনয় ও নম্রতা' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব এস, এম, রহমত উল্লাহ্। 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উচ্চ মর্যাদা' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মুহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মানবপ্রেম' এ বিষয়ে আলোচনা করেন মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। নযম পরিবেশন করেন জনাব লোকমান লস্কর। এরপর 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইসলাম প্রচার' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ মকবুল হোসেন, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মূসা মিয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৩/০১/২০১৬ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তামান্না হাছিন। হাদীস পাঠ করেন সেলিনা খোকা, আহাদনামা পাঠ করেন রিনাত ফৌজিয়া। নযম পাঠ করেন ফাইজা সুলতানা ইমা। আলোচনা পর্বে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও বাল্যকাল' সম্পর্কে আলোচনা করেন বিলকিস তাহের। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন' নিয়ে আলোচনা করেন আমাতুস সামি। নযম পাঠ করেন দৌলতুন নেছা রাফিয়া, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম চরিত্র' বিষয়ে আলোচনা করেন দৌলতুন নেছা। 'ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট আফরোজা মতিন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে ২২জন মেহমানসহ মোট ১৬৯ জন উপস্থিত ছিলেন। **–শাহিনা সেলিম**

সরিষাবাড়ীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১০/০৩/২০১৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর সরিষাবাড়ী জামা'তে ইজারাপাড়ায় জনাব সামস উদ্দীন মাষ্টার-এর বাড়ীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল ওয়াদুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ মওলানা জহুরুল হক। স্বরচিত বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব সামস উদ্দীন মাষ্টার। এরপর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন আদর্শ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন ভেলু, জনাব ডা: মোজাম্মেল হোসেন, মৌঃ জিল্লুর রহমান, জনাব হাফিজুর রহমান এবং মৌ, আসাদুজ্জামান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি হয়। এতে বিভিন্ন স্থান থেকে ৩০ জন মেহমানসহ মোট ৬০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

গত ২০/০৩/২০১৬ তারিখ রোজ রবিবার বাদ আসর সরিষাবাড়ী জামা'তের মহাদান এলাকায় জনাব জামাল উদ্দিন কালু মিয়ার বাড়িতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল ওয়াদুদ-এর সভাপতিত্বে। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মওলানা জহুরুল হক এবং নযম পেশ করেন জনাব মামুনুর রশিদ। এরপর মহানবী (সা.)-এর উল্লেখযোগ্য আদর্শমূলক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন, মৌঃ জিল্লুর রহমান, ফরিদুল ইসলাম এবং মৌ. আসাদুজ্জামান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি হয়। এতে ২৫ জন জেরে তবলীগ মেহমান ও ৩০ আহমদী উপস্থিত ছিলেন। জলসায় ১৪ জন বয়আত গ্রহণ করেন। – আব্দুল ওয়াদুদ

মাহীগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৭/০৩/২০১৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার মাহীগঞ্জের হালকা বড়দরগায় সীরতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাজমুল হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব গোলাম রাব্বি। নযম পাঠ করেন জনাব রাশেদ মিলন। সীরতুন নবী (সা.) জলসায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব মোফাখখারুল ইসলাম, জনাব জহির রায়হান এবং মৌ. আসলাম আহমদ। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি করা হয়। এতে ১৭ জন মেহমানসহ মোট ৬৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আহমদ হোসেন

রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তালিম ক্লাস

গত ২৫-২৬ মার্চ ২০১৬ দুই দিন ব্যাপী রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সিলেবাস অনুযায়ী শুদ্ধ কুরআন ক্লাস, শেষ ১০টি সূরা, দোয়া ইত্যাদির ওপর ক্লাস নেওয়া হয়। ২৬ তারিখে পরীক্ষা নেওয়া হয়। ক্লাসে ১ম দিন উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন। ২য় দিন উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন।

দিলরুবা জামান মুক্তা

কোড্ডা জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডার উদ্যোগে সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সিবগাতুর রহমান মুকুল। নযম পরিবেশন করেন জনাব শাহরিয়ার রেজা জোসেফ। বক্তৃতা পর্বেঃ 'মহানবী (সা.) এর বিনয় ও নম্রতা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ্। 'বিশ্বব্যাপী মানব কল্যাণে মহানবীর অবদান' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ্। 'খাতামান নবীঈন (সা.) এর তাৎপর্য' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব এনামুল হক ইন্টু। 'বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় মহানবীর আদর্শ' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নয়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ। এরপর বাদ মাগরিব প্রশ্নত্তোর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গাজী মাজহারুল খোকন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৩/০৩/২০১৬ রোজ বুধবার বাদ মাগরীব থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নুর উদ্দিন আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব আতাই রাব্বি ও কাউসার আহমদ মঞ্জুর। দিবসটির ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব আল আমিন আহমদ। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) কে মান্য করার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলভী আবু তাহের। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মানবতা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। সবশেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ১২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

১৮তম বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদনগরে অনুষ্ঠিত

গত ০১ জানুয়ারি হতে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৮তম বিভাগীয় সম্মেলন আহমদনগর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে রংপুর বিভাগের ১৬টি জামা'ত থেকে ৮৮ জন ওয়াকফে নও , ৪৯ মাতা ৩৮ জন পিতা অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলন শুরু হয় ১ জানুয়ারি শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল এর সভাপতিত্বে। এতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহবুব আহমদ এবং নযম পাঠ করেন নাহিদ আহমদ। এতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী আলহাজ্জ তাহের আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং জনাব আনোয়ার আলী। শেষে সভাপতি দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ৭ দিন ব্যাপী ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। এছাড়া ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং মওলানা আলহাজ্জ সালেহ আহমদ, মুরবী সিলসিলাহ্। ৭ জানুয়ারি সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

আলহাজ্জ তাহের আহমদ বাচ্চু

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে সিহতে-ই জিসমানী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০৪/২০১৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে সিহতে-ই জিসমানী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা আমাতুল কাইয়ূম, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন ফাতেমা নুসরত, সেক্রেটারী সিহতে-ই জিসমানী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহাজাদী রোকেয়া

মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুরের উদ্যোগে নও মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৬ শে মার্চ ২০১৬ রোজ শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুরের উদ্যোগে নও মোবাঈন সম্মেলন মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিরপুরে অবস্থানরত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বয়আত গ্রহণকারী খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা নও মোবাঈন সদস্য ও সদস্যাগণের জন্য এই তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীম আলা, জনাব আবু জাকির আহমদ। স্বাগত বক্তব্যে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর এর নও মোবাঈন সদস্য ও সদস্যগণের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরেন এবং তাদের জামা'তের রুটিন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন।

সম্মেলনে মূল তরবিয়তী বক্তব্য পেশ করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে উপস্থিত সকলকে নসিহত করেন এবং সামাজিক ব্যাধি ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিজ গৃহে অনুশীলনের আহবান জানান। তিনি নিয়মিতভাবে দোয়া করা এবং যুগ খলিফার (আই.) সাথে ব্যাক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নও মোবাঈন সদস্য ও সদস্যাগণ তাদের পরিচয় পেশ করেন এবং বয়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন এবং আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হওয়ার পর আধ্যাত্মিকভাবে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তার বর্ণনা করেন। মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সদর মজলিস আনসারুল্লাহ আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী তার তরবিয়তী বক্তব্যে নও মোবাঈনদের জন্য আয়োজিত তরবিয়তী ক্লাসের প্রশংসা করেন এবং নও মোবাঈন সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন এবং সাংগঠনিক রুটিন কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী নও মোবাঈন জনাব মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন এবং সাবেক সদর মজলিস আনসারুল্লাহ ও পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। দুপুর ৩.৩০ মিনিট থেকে রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলমান এই তরবিয়তী ক্লাসে ৫৭ জন নও মোবাঈন সদস্য ও সদস্যা এবং ৩০ জন মেহমানসহ মোট ২৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ৬ জন মহিলা বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে নও মোবাঈনদের জন্য আয়োজিত তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্ত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর এর আমীর জনাব বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী। স্থানীয় মজলিসের খাদেমরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে নিরাপত্তা কার্যক্রম ও খাবার বিতরনের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আলহাজ্জ আবুল হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এ মসীহ্ মাওউদ দিবস

গত ২৫ মার্চ লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে মসীহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লার প্রেসিডেন্ট শারমীন আক্তার শিখা। দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় আমেনা করিম-এর পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে। হাদীস পাঠ করেন তানজিলা সিদ্দিকা এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মালফুযাত থেকে পড়ে শুনান কামরুন্নেসা মমি। আলোচনা পর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন শারমীন আক্তার শিখা এবং বদরুন্নেসা এমি। নযম পাঠ করেন ভিকারুন্নেসা লুনা। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়। উল্লেখ্য যে, লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তক এবং 'তরবীয়তে আওলাদ' পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

উথলীতে মসীহ্ মাওউদ দিবস

গত ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব তাহির খালিদ, আতিকুর রহমান, আব্দুল মান্নান এবং মুরব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৬ জন মেহমানসহ মোট ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। **–মহিউদ্দীন আহমদ**

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের ওয়াক্‌ফে নওদের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের জাতীয় ওয়াক্‌ফে নও বিভাগের আয়োজনে গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে আয়োজিত হয়ে গেল জাতীয় ওয়াক্‌ফে নও ইজতেমা। উল্লেখ্য, ২৭ ফ্রেব্রুয়ারী মেয়ে ওয়াক্‌ফে নও এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী ছেলে ওয়াকফে নও মুজাহিদরা এই মহতি ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

সর্বমোট ১২০০ ছেলে এবং ৯০০ মেয়ে এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন, যেখানে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মশালা, সিলেবাস টেস্ট এবং বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

অংশগ্রহণের দিক দিয়ে গত বছরের তুলনায় এ বছরের ইজতেমায় সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দু'দিনের এই ইজতেমায় প্রায় ছয় শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত থেকে ইজতেমাকে প্রাণবন্ত করেছেন এবং নিজেদের সন্তানদের উৎসাহ প্রদান করেছেন।

দু'দিনব্যাপী এ ইজতেমায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও প্রশিক্ষণমূলক প্রেজেন্টেশন এবং কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে ও শিখতে পেরেছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: জামেয়ার দৈনন্দিন জীবন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত, শূরার সূচনা কীভাবে হয়, প্রচলিত গণমাধ্যমকে কীভাবে কাজে লাগানো ইত্যাদি।

সমাপনী অধিবেশনে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) দু'দিনই এ মহতি ইজতেমায় স্বশরীরে উপস্থিত হন এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

এর পূর্বে, হুযূর (আই.) ইজতেমার বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য এবং সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করার জন্য ৫ জন ওয়াকফে নও মেয়েকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন।

এরপর হুযূর (আই.) তাঁর দু'টি সমাপণী বক্তব্যেই অংশগ্রহণকারী ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের ওপর ভবিষ্যতে অর্পিত হতে যাওয়া বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেন, কেননা, তারা স্বদিচ্ছায় ইসলাম ধর্মের সঠিক শিক্ষা প্রচারের নিমিত্তে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

দু'দিনই হুযূর (আই.) তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানির উদ্যোগে এযলিঞ্জেন (Esslingen) শহরে "সন্ত্রাস নির্মূল" শিরোনামে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান

বাদেন-উয়েটেমবার্গ অঙ্গরাজ্যের এযলিঞ্জেন (Esslingen) শহরে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যার শিরোনাম রাখা হয়, "সন্ত্রাস নির্মূল"। মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব ইমতিয়াজ শাহীন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে ইসলামের শান্তিময় শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনচরিত তুলে ধরেন, যার মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর চরিত্র ফুঠে উঠে।

এমটিএ'র এর সাথে আলাপকালে একজন সম্মানিত অতিথি জানান, "এটি খুবই ভালো একটি অনুষ্ঠান ছিলো। ইসলামের সত্যিকার ও শান্তিময় শিক্ষামালা এ অনুষ্টানে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠান পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সত্যিই উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে"।

আরেকজন অতিথি বলেন, "আমি এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ইসলামের শান্তিময় বাণী সম্পর্কে জানতে পেরে সত্যিই অভিভুত। এটি দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করছে।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী

অস্বস্তিকর গরমে ৮ কাজ হতে সাবধান

শীতকালের চেয়ে গরম কালটা মনোরম হলেও অনেক সময়েই প্রচণ্ড গা-জ্বালানো গরম পড়ে। বিশেষ করে আমাদের দেশের গরমকালটা একটু কষ্টকরই। তাই সুস্থ্য থাকতে হলে গরম কালে কিছু বিষয় থেকে সাবধাণ থাকা জরুরী। সেগুলো হলো-

১) বেশি রোদে ঘুরবেন না।

২) পানি না খেয়ে কখনো থাকবেন না। তেষ্টা না পেলেও পানি খান।

৩) খুব বেশি মাংস-ডিম বা মাছ এড়িয়ে চলুন। বেশি পরিমাণে স্যালাড, কাঁচা সবজি খাওয়া উচিত।

৪) দিনের বেলা খুব গরমে কায়িক পরিশ্রম যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলুন।

৫) এয়ার কন্ডিশনড জায়গায় থাকুন। বাড়িতে না থাকলে ঘরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা জায়গায় থাকুন। ঠান্ডা পানিতে বারবার স্নান করুন।

৬) গাঢ় রঙের টাইট ফিটিংস ও ভারী জামাকাপড় পরবেন না। হাল্কা রঙের লুজ ফিটিং ও হাল্কা জামাকাপড় পরুন।

৭) অতিরিক্ত ঘাম, মাথা ঝিম ঝিম, বমি বমি ভাব, ক্লান্তি খুব বেশি এলে একটানা কাজ করবেন না। বারবার বিশ্রাম নিন।

৮) নেশাদ্রব্য পরিহার করুন।

(সূত্রঃ আমাদের সময়)

চুল পড়া রোধে পেয়ারা পাতা

চুল পড়া সমস্যায় ভুগছেন না এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে। অনেকের আবার চুল পড়া যেন নিত্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারো কারো তো চুল পড়তে পড়তে একপ্রকার টাকই হয়ে গেছে। এ থেকে উত্তরণে আমরা কত কিছুই না ব্যবহার করে থাকি।

অনেকেই ঝরে পড়া চুল নতুন করে গজানোর আশায় বিভিন্ন কোম্পানির উর্ভরজাত পণ্য বা ওষুধ ব্যবহার করেন। চুল না থাকা সত্ত্বেও মাথার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ধরে রাখতে কেউ কেউ নকল চুলও ব্যবহার করেন। যাহোক, চুল পড়া ঠেকাতে পেয়ারা পাতা বেশ কার্যকরী বলে একদল বিজ্ঞানীর মত। গবেষকদের দাবি, পেয়ারা পাতা নিয়মিত ব্যবহারের ফলে মাথার চুলের ঝরে পড়া রোধ হয় এবং চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পেয়ারা পাতায় রয়েছে প্রচুর ভিটামিন বি যা স্বাস্থ্যকর চুলের জন্য খুবই উপকারী।

তাদের আরো দাবি, পেয়ারা পাতা অবশ্যই মাথার চুল ঝরে পড়া রোধ করবে। সেইসঙ্গে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করবে। এটি চুলের সংযুক্তিস্থল অর্থাৎ গ্রন্থিকোষ ও শিখড়কে অনেক শক্ত করে।

ব্যবহারের বিধিমালা :

কযকেটি পেয়ারা পাতা পরিষ্কার পানিতে ২০ মিনিট সিদ্ধ করার পর এর সঙ্গে ঠাণ্ডা পানির মিশ্রণ দিতে হবে। এরপর তা মাথার খুলিতে দিয়ে এক ঘণ্টা পর মাথা পরিষ্কার করতে হবে। এই পদ্ধতিতে ভালো ফল পাওয়ার জন্য রাতে ঘুমানোর আগে করাই শ্রেয়।

(সূত্রঃ ইউকলি হেলথ লাইফ)

ঠাণ্ডা প্রতিরোধে আনারস

মিষ্টি ও রসাল হিসেবে আনারস খুবই পরিচিত একটি ফল। এখন বাজারে বেশ সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে এটি। সহজলভ্য এই ফলটি কিন্তু অনেক পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। এতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে আমিষ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং খাদ্যশক্তি রয়েছে যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ঠাণ্ডা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া হাড় মজবুত করে এবং দাঁত ও মাড়ির সুস্থতা রক্ষা করাসহ আরও অনেক কাজ এই ফলটি। কাজেই সুস্থ থাকতে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আমাদের এই ফলটি রাখা উচিত।

ওজন কমায়আনারসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম রয়েছে। আঁশযুক্ত এই ফলটি থেকে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া যায় যা চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। তাই ওজন কমাতে আনারস খাওয়ার বিকল্প নেই।

ঠাণ্ডা ও কাশি প্রতিরোধ করে বর্ষাকালীন এই ফলটিতে ভিটামিন সিয়ের পরিমাণ বেশি থাকায় তা ভাইরাসজনিত ঠাণ্ডা ও কাশি প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া এতে ব্রোমেলেইন নামে এমন একটি উপাদান রয়েছে যা ঠাণ্ডা ও কাশি সারাতেও সাহায্য করে। শক্তি বৃদ্ধি করে আনারসে ম্যাঙ্গানিজ নামে এক প্রকার খনিজ উপাদান রয়েছে, যা মানবদেহের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করেশরীরের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনারস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে দাঁত মজবুত করে ও মাড়িকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে আনারস। কাজেই দাতেঁর সুস্থতা রক্ষায় এটা প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখা যেতেই পারে।

কৃমি নির্মূল করেআনারসকে একটি কৃমিনাশক ফল বলা চলে। খালি পেটে কিংবা সকালবেলা উঠে আনারস খেলে কৃমি দূর হয়।

রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করেআনারসে ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা শরীরে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে সারাদেহে সঠিকভাবে রক্ত সঞ্চালন ঘটে।

হজমে সাহায্য করেআনারসের ব্রোমেলেইন হজমে সাহায্যকারী বিভিন্ন রসকে অ্যাসেডিক হতে দেয় না। এছাড়া এতে প্রোটিন পরিপাকের উপাদান থাকে যা দেহের হজম ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। তাই বদহজমের সমস্যা দূর করতে আনারস খান।

আনারস বাজারে সহজেই পাওয়া যায় আর দামেও সস্তা। কাজেই সুস্থ থাকতে চাইলে প্রতিদিন ফলটি খাওয়ার চেষ্টা করুন। এতে পুষ্টির অভার পূরণের পাশাপাশি রোগমুক্তিও ঘটবে।

(সূত্রঃ আমাদের সময়)

সংগ্রহ ও উপস্থাপনা: সুমন মাহমুদ

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

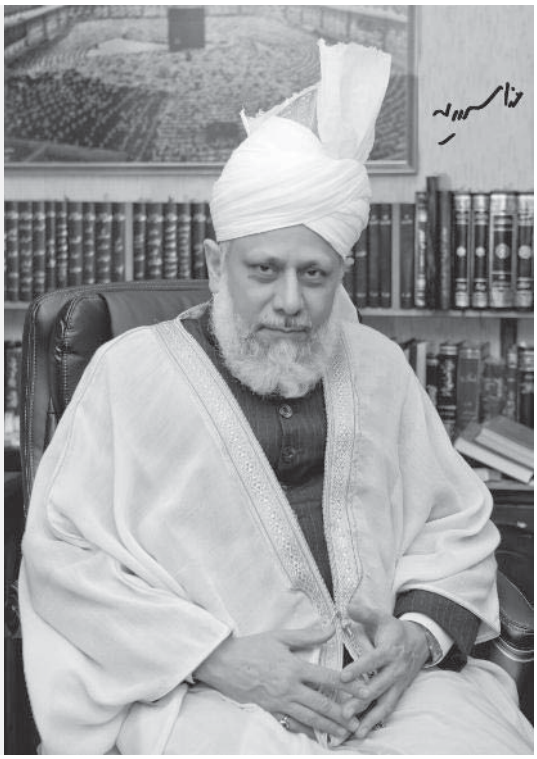

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 19 Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th April, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্তত: আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ৯.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com